KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ সাদার্ন এভিনিউ, কল-২৬
Collection : KLMLGK	Publisher : শ্রীর প্রকাশ
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : 89/৯ 89/১০ 89/৩ 89/১১ 89/১২	Year of Publication : Nov 1986 Dec 1986 Jan 1987 March 1987 April 1987
	Condition : Brittle / Good
Editor : আবদুল গফুর	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

এপ্রিল
১৯৮৭

পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতও যদি পারমাণবিক মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নামে? তখন কে কার উপর পরমাণু-বোমা ফেলবে? কোথায় ফেলবে? কাদের উপর ফেলবে? তাতে উপমহাদেশের অসংখ্য মানুষের মৃত্যুই শুধু নয়, দু-দেশের বহু শতাব্দীর পুরাকীর্তিরও ঘটবে সমূহ বিনাশ! জীবনসায়াহ্নে প্রবীণ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের এমনি আরো অনেক আকুল উদ্‌বেগ ফুটে উঠেছে তাঁর "পরমাণু-চিন্তা" প্রবন্ধে।

এদেশে শ্রমিকদের শ্রেণীসংগঠন দুর্বল নয়, কিন্তু 'কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণী তাঁদের শেষ অস্ত্র—সাধারণ ধর্মঘট—প্রয়োগ করেন নি কোনোদিন।' "তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা" প্রবন্ধে দিনাজপুর তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক অধ্যাপক সুনীল সেন গত ৫০ বছরের কৃষকসংগ্রামের উত্থানপতনের ইতিহাস বলতে গিয়ে তার মৌলিক ত্রুটিগুলির প্রতিও অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন।

মনুবিহিত বর্ণাশ্রমপ্রথার অন্ধকার কারাগারে যুগ-যুগ ধরে যাঁরা ছিলেন মূক বন্দী, হিন্দু-সমাজের সেই তথাকথিত "হরিজন"রা আজ বর্ণব্যবস্থার সব বাধা ভেঙে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগ্রামে অবতীর্ণ। মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক দলিত সাহিত্য সেই সংগ্রামেরই দর্পণ। বীণা আলাসের "দলিত সাহিত্য" প্রবন্ধে এই বিদ্রোহী লেখকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে।

কোন্ পটভূমিতে গোরখাল্যানডের দাবি সমস্ত গোরখা মানুষকে উদ্বেল করে তুলেছে অধ্যাপক পুলকনারায়ণ ধরের বিশ্লেষণ।

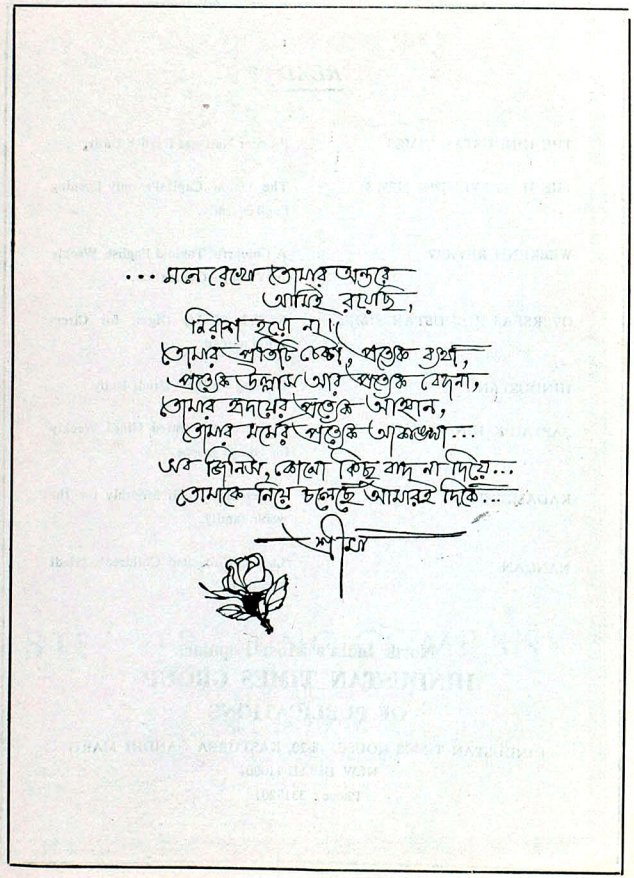

বর্ষ ৪৭। সংখ্যা ১২
এপ্রিল ১৯৮৭
চৈত্র ১৩৯৩

পরমাণু-চিন্তা অন্নদাশঙ্কর রায় ৯২৭
তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা সুনীল সেন ৯৪৫
দলিত সাহিত্য বীণা আলাসে ৯৬৮

গাছগুলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ৯৩৪
শৃগালের সময় শেখর আহ্‌মেদ ৯৩৫
দুটো কৃষ্ণসাগর মধুসূদন পাল ৯৩৬
পটভূমি : সুন্দরবন শৌনক বর্মণ ৯৩৭

বৃত্তের বাইরে আবুল হাসানাত ৯৩৮
অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৯৫৫

এই দেশ ৯৭৪
গোরখাল্যানড প্রসঙ্গে পুলকনারায়ণ ধর

গ্রন্থসমালোচনা ৯৭৮
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

চিত্রকলা ৯৯৩
পিকাসোর গ্র্যাফিক্‌স্ রবীন্দ্র মজুমদার

নাটক ৯৯৫
তৃতীয় থিয়েটার এবং বাদল সরকার অভিজিৎ করগুপ্ত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

চতুরঙ্গ ৪৭ বর্ষে (১৯৮৬ মে থেকে ১৯৮৭ মার্চ) প্রকাশিত
কয়েকটি প্রবন্ধের তালিকা

মে ১৯৮৬

১. ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে—শিবনারায়ণ রায়
২. চৈতন্যদেবের ভাববিপ্লব : তার তাৎপর্য ও পরিণাম—আহমদ শরীফ (বাংলাদেশ)
৩. আমার চৈতন্যে রবীন্দ্রনাথ—শামসুর রাহমান (বাংলাদেশ)

জুন ১৯৮৬

১. ইতিহাস : বামপন্থা : ভবিষ্যৎ—সরোজ মুখোপাধ্যায় (বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান)
২. বিপন্ন মুসলিম মহিলা—জাস্টিস এস. এ. মাসুদ (প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট)
৩. রবীন্দ্রনাথের কবিতা-পাঠান্তর—সন্‌জীদা খাতুন (বাংলাদেশের বিশিষ্ট রবীন্দ্র-গবেষক ও গায়িকা)

জুলাই ১৯৮৬

১. বন্ধন-ছেদন (ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রবণতার গভীর বিশ্লেষণ)—পার্থ চট্টোপাধ্যায় (বিশিষ্ট ইতিহাস-গবেষক)
২. রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের ধারণা—মনসুর মুসা (বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভাষা-তত্ত্ববিদ)

অগস্ট ১৯৮৬

১. সীমান্তচিন্তা (উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমান্তচিন্তা)—অম্লান দত্ত
২. বাংলাদেশের-নারী আন্দোলনের ইতিহাস—সুলতানা কামাল (বাংলাদেশের বিশিষ্ট মহিলানেত্রী)
৩. নজরুল ইসলামের কবিস্বভাব : শক্তিপূজা—আহমদ শরীফ (বাংলাদেশ)

সেপটেমবর ১৯৮৬

১. শিক্ষিত বেকার—ভবতোষ দত্ত (খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ)
২. গড় শ্রীখণ্ড থেকে রাজনগর (অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাহিত্যকৃতির সামগ্রিক পর্যালোচনা) —অলোক রায়
৩. সাম্প্রতিক সিন্‌হলি সাহিত্য—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৪. বাংলাদেশের চলচ্চিত্র—সৈয়দ আবুল মকসুদ
৫. প্রিটোরিয়ার লড়াই—ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অকটোবর ১৯৮৬

১. আধুনিক বাঙলা চিত্রশিল্প আর গ্রাফিক্ আর্ট্‌স্—রাধাপ্রসাদ গুপ্ত
২. বুদ্ধিজীবীর মৌষল পর্ব (একখানি ইরানী উপন্যাস)—সৌরীন ভট্টাচার্য
৩. ক্যাসেট পাইরেসি—দিনেন্দ্র চৌধুরী
৪. হিংসার বদলে [১] (ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলায় আদর্শগত পন্থার অন্বেষা) —ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নভেমবর ১৯৮৬

১. বিজ্ঞান, আধুনিকীকরণ ও কার্ল মার্কস—সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
২. বাংলাদেশে বাঙলা সাহিত্যের গবেষণা—ওয়াকিল আহমদ
৩. হিংসার বদলে [২]—ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ডিসেমবর ১৯৮৬

১. মানবেন্দ্রনাথের মানসলোক—অমলকুমার মুখোপাধ্যায়
২. বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাস-নির্দিষ্ট অবস্থিতি—অজয় রায় (বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা)
৩. একটি অসাধারণ ইন্দোনেশীয় উপন্যাস—অনিরুদ্ধ চৌধুরী
৪. কমনওয়েলথ : কোথা থেকে কোথায়—ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জানুয়ারি ১৯৮৭

১. প্রকৌশল ও প্রযুক্তি—ভারতের বর্তমান অবস্থা—মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)
২. বিভাগোত্তর পশ্চিমবাঙলায় বাঙালি মুসলমানের চিন্তাচেতনার গতিপ্রকৃতি—আবদুর রউফ
৩. ইউনেসকো সংকটের ভূমিকা—সৌরীন ভট্টাচার্য

ফেবরুয়ারি ১৯৮৭

১. গ্রামভারতে জাত ও শ্রেণী—অশোক মিত্র (প্রাক্তন সেনসাস কমিশনার)
২. দাও ফিরে সে অরণ্য—(যাত্রাপালার গত পঞ্চাশ বছরের ইতিবৃত্ত)—ব্রজেন্দ্রকুমার দে ('পালাসম্রাট')
৩. চীন-ভারত সীমান্তবিরোধ সম্পর্কে—ড. করুণাকর গুপ্ত (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ)

মার্চ ১৯৮৭

১. পশ্চিমবঙ্গে অর্থনীতি-গবেষণা—ভবতোষ দত্ত (খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ)
২. মণ্টো : তিক্ত, বিষণ্ণ ভালোবাসা (উর্দু সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিমান আধুনিক গল্পকার সাদাৎ হোসেন মণ্টোর সাহিত্যকৃতির সামগ্রিক পর্যালোচনা)—কিরণশঙ্কর মৈত্র
৩. বনলতা ও হেলেন (জীবনানন্দের কবিস্বভাবের মূল ভারতীয় উৎস সন্ধান)—শ্রীকান্ত রায়

৪৭ বর্ষের কিছু-কিছু সংখ্যা এখনও চতুরঙ্গের দপ্তরে পাওয়া যাচ্ছে

Hindustan Wires Limited

Registered Office :

3A, Shakespeare Sarani, Calcutta-700 016

Phone : 44-6745 (3 lines) Telegram : WIREFIELD

Factory :

B. T. Road, Sukchar, 24 Parganas

Phone : 58-1947, 58-1934

Manufacturers of :

Stainless Steel Wires, Alloy Steel Wires, High Tensile Galvanised Steel Wires for ACSR to IS : 398 and High Tensile Wire for Prestressed Concrete to IS : 1785

And

Many other specialised High Carbon & Mild Steel Wires such as High Tensile, Spring Steel, Tyre Bead, Cable Armouring, Cycle Spoke, Umbrella Card & Gill Pin Wires and G. I., Annealed, Ball Bearing, Electrode Core Wires etc.

In Technical Collaboration with

MESSRS KOBE STEEL WORKS LIMITED &

MESSRS SINKO WIRE COMPANY LIMITED

JAPAN

পরমাণু-চিন্তা

অন্নদাশঙ্কর রায়

এখন আমার পরমার্থচিন্তার বয়স। পরমার্থচিন্তা না করে পরমাণু-চিন্তা করছি। কারণ পরমাণুর উপরেই নির্ভর করছে ইহলোকে আর কতদিন স্থিতি। কেবল আমার একার নয়, সর্ব মানবের তথা সর্ব জীবের।

পরমাণবিক অস্ত্রের উদ্‌ভাবন না হলে কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জারমানির পরাজয় হত না? হত নিশ্চয়ই, তার প্রমাণ পরমাণবিক অস্ত্র জারমানির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার পূর্বেই সে অপরাপর অস্ত্রের দ্বারা পরাস্ত হল। জাপানও কি সেইভাবে পরাজিত হত না? হত বইকি, কিন্তু আরো সময় লাগত। সেই সময়টা যেত সোভিয়েটের অনুকূলে। জারমানির সঙ্গে যতদিন যুদ্ধ চলছিল ততদিন সোভিয়েট জাপানের সঙ্গে লড়তে চায় নি। দুই ফ্রন্টে লড়তে গেলে সে নিজেই হেরে যেত। হিটলারকে হারিয়ে দেবার পর তার হাত খালি হয়। সে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আর মানচুরিয়া কেড়ে নেয়। এর পরেই আসত জাপানের উত্তরাংশের পালা। দক্ষিণ থেকে আমেরিকা আর উত্তর থেকে সোভিয়েট মিলে জাপান ভাগ করে নিত। যেমন জারমানি নিয়েছিল ভাগ করে।

তাই কালবিলম্ব না করে আমেরিকা হিরোশিমা আর নাগাসাকির উপর পরমাণবিক বোমা ফেলে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করে দেয়। তখন সোভিয়েটকে আর জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে হয় না। জাপান পরাস্ত এবং সোভিয়েট নিরস্ত হয়। নইলে যুদ্ধের ফলাফল অন্যরূপ হত। আমরা দেখতে পেতুম উত্তর জাপান আর দক্ষিণ জাপান বলে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। যেমন পূর্ব জারমানি ও পশ্চিম জারমানি। দূরদৃষ্টি থাকলে জাপান জারমানির পরাজয় দেখে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করত। শর্তাধীন আত্মসমর্পণের জন্যে সময়ক্ষেপ করত না। তার জানা উচিত ছিল যে হিটলারকে হারিয়ে দিয়ে স্টালিনের হাত খালি। আমেরিকাকে তিনি সমগ্র জাপান গ্রাস করতে দিতেন না। যেমন সমগ্র জারমানি গ্রাস করতে দেন নি। পরমাণবিক অস্ত্র দিয়ে আমেরিকা সমগ্র জাপান জয় করে নেয়।

এমন আশ্চর্য অস্ত্র যার হাতে আছে সে কেন পরবর্তী কালে উত্তর কোরিয়ার উপর সে অস্ত্র ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক হয়? সেনাপতি ম্যাক-আর্থার তেমন এক প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ট্রুমান সে প্রস্তাব নাকচ করে ম্যাকআর্থারকে সরিয়ে দেন। জাপানবিজেতার চূড়ান্ত অপমান। উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হয়ে যায়। আমেরিকা কেন হতে দিল? এর জবাব পরমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করলে চীন ক্ষমা করত না।

চীনের সঙ্গে লড়তে হত। চীন-মারকিন যুদ্ধ বছরের পর বছর গড়াত। আমেরিকার জনমত দীর্ঘকালীন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। আমেরিকার বলক্ষয়ে সোভিয়েটের বলবৃদ্ধি। তাই আমেরিকা কোরিয়ার অর্ধেক দখল করে বাকিটা ছেড়ে দেয়। অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

ভিয়েটনামের যুদ্ধেও পরমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেখানেও সেই একই ব্যাপার। উত্তর ভিয়েতনামের উপর পরমাণবিক বোমা ফেললে চীন ক্ষমা করত না। চীনের সঙ্গেও লড়তে হত। চীনের সঙ্গে যুদ্ধ মানে আমেরিকার বলক্ষয়, সোভিয়েটের দলবৃদ্ধি। এখানে বলে রাখি যে পরমাণবিক বোমা জাপানে যেমন ফলপ্রদ হয়েছিল চীনে তেমন হত না। অর্থাৎ চীন বিনা শর্তে আত্ম-সমর্পণ করত না। চীন দেশটা এত বৃহৎ যে মারকিন সৈন্য সমস্তটা দখল করতে পারত না, বাকিটা থেকে চীন লড়াই চালিয়ে যেত আর কোটি-কোটি প্রাণের বিনিময়ে আখেরে জয়ী হত। পরমাণবিক অস্ত্রও ষাট-সত্তর কোটি মানুষের দুর্জয় প্রতিরোধের দুর্গ ধ্বংস করতে পারত না। চীনের ছিল স্পেস আর ম্যানপাওয়ার। জাপানের শুধু ম্যানপাওয়ার। তাও তিন বছর ধরে লড়তে-লড়তে হতবল।

সেই যে ১৯৪৫ সালে পরমাণবিক বোমা পড়েছিল তার পরে আর পড়ে নি। ইতিমধ্যে আরো ভয়ংকর বোমা, আরো অধিকসংখ্যক বোমা, আরো মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র মজুত হয়েছে। এখন শুধু আমেরিকার ভাণ্ডারে নয়, আরো চারটি শক্তির ভাণ্ডারেও। তারা সোভিয়েট, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং চীন। আবার যদি মহাযুদ্ধ বাধে তবে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ আমেরিকা আর সোভিয়েট। আমেরিকার শিবিরে ব্রিটেন আর ফ্রান্স, এটা নিশ্চিত। সোভিয়েটের শিবিরে চীন কি না অনিশ্চিত। এটা কিন্তু অবধারিত যে যুদ্ধের প্রথম দিনেই যদি পরমাণবিক আতশবাজি হয় তবে দ্বিতীয় দিন কেউ বেঁচে থাকবে না। শেয়াল-কুকুর-শকুনিও না। মসকো, লেনিনগ্রাড, লনডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, রোম ধুলোয় মিশে যাবে। সভ্যতাই হবে সভ্যতার সর্বনাশের হেতু।

আইনস্টাইন যখন রুজভেলটকে লিখেছিলেন যে পরমাণু-বিভাজন করে বোমা তৈরি করা সম্ভব তখন তাঁর ধারণা ছিল বোমাটা জারমানির নাৎসিদের উপরেই পড়বে। পাপীরাই মরবে, পুণ্যবানরা বাঁচবে। দেখা গেল সে বোমা জারমানদের উপরে না পড়ে জাপানিদের উপরেই পড়ল। পাপীদের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যবানরাও মরল। এই হত্যাবিভীষিকা আইন-স্টাইনকে বিমূঢ় করে। তিনি পরমাণবিক বোমার বিরোধী হন। কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদনের পর আদিমানব আদমের যে দশা হয়েছিল পরমাণবিক শক্তি আস্বাদনের পর আধুনিক মানবেরও সেই দশা। যাদের পরমাণবিক অস্ত্র আছে তারা সে অস্ত্র ছাড়বে না। যাদের নেই তারা সেই অস্ত্র নির্মাণ করবে। ফলে যদি মানববংশ উজাড় হয়ে যায় তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই।

পরমাণবিক শক্তি যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে পারা যাবে, এটা আইনস্টাইনের কল্পনায় ছিল না। এটা পরবর্তী কালের যোজনা। এখন শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের দোহাই দিয়ে যত্রতত্র পরমাণবিক চুল্লি স্থাপন করা হচ্ছে। সম্প্রতি সোভিয়েটের চেরনোবিলে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল তার দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে আশেপাশের বিভিন্ন দেশকে। এরকম দুর্ঘটনা যে আর কখনো এবং আর কোনোখানে ঘটবে না, তা কে জোর করে বলতে পারে? শান্তিপূর্ণ ব্যবহারেও অশান্তি কম নয়।

যুদ্ধের প্রয়োজনে যে শক্তির ব্যবহার শান্তির প্রয়োজনেও তার ব্যবহার অযৌক্তিক নয়। ডাই-নামাইট তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। পরমাণবিক শক্তিও হয়তো নানাভাবে মানুষের উপকারে লাগবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছি

নে। মানুষ যদি সমস্তক্ষণ মরণভয়ে অস্থিরই হল তবে ঘরে-ঘরে বিজলির আলো, রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ ইত্যাদি তাকে কোন্ স্বর্গে নিয়ে যাবে? যুদ্ধের জন্যেই হোক আর শান্তির জন্যেই হোক, পরমাণবিক শক্তি কি না হলেই নয়? এ শক্তি না থাকলেও যুদ্ধ-জয় সম্ভব হত। এ শক্তি না হলেও বিদ্যুতের উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্ভব। কেন তবে এর পেছনে এত অর্থব্যয়? সেই অর্থ দিয়ে কি ক্ষুধার্তের ক্ষুধা আর তৃষার্তের তৃষা দূর করা যেত না? বিশ্বের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এখন অন্নাভাব আর জলাভাব। শীতবস্ত্রের অভাব। আশ্রয়ের অভাব। চিকিৎসার অভাব। শিক্ষার অভাব। জ্বালানির অভাব। পরমাণবিক শক্তি দিয়ে এসব অভাবের প্রতিকার যদি না হয় তবে তার দ্বারা বিদ্যুতের উৎপাদনবৃদ্ধির সম্ভাবনা সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। ব্যতিক্রম হয়তো দু-চারটি ভাগ্যবান দেশের উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্ত শ্রেণী। পরমাণবিক শক্তি যতদিন না সর্বসাধারণের বহুবিধ অভাব মোচনের কাজে লাগছে ততদিন বিশ্বাস করা কঠিন হবে যে এই শক্তি মুষ্টিমেয় মানুষের ক্ষমতা-বিস্তারের জন্য নয়। এর আনুষঙ্গিক ঝুঁকিটা তো সর্বসাধারণেরই। দুর্ঘটনায় মরবে যারা তারা সর্ব স্তরের মানুষ। যুদ্ধকালে তো সবাই একসঙ্গে নির্বংশ হবে।

পরমাণবিক মারণাস্ত্র আপাতত পাঁচটি নেশনের হাতেই আছে। শোনা যায় দক্ষিণ আফ্রিকা আর ইসরায়েলও নাকি গোপনে পরমাণবিক বোমা বানিয়ে ফেলেছে। আজকাল কিছুই বেশিদিন গোপন থাকে না। গুজবটা সত্য হয়ে থাকলে উক্ত দুই নেশনের শত্রুদের পক্ষে ভাবনার কথা। শত্রুরাও যে চুপ করে বসে থাকবে তা নয়। ওরাও চোরাগোপ্তাভাবে পরমাণবিক বোমা বানাবে।

ভারতের হাতে পরমাণবিক বোমা আছে, এই সন্দেহ পাকিস্তানিদের মনে বদ্ধমূল। সেইজন্যে তারাও নাকি তেমন এক বোমা তৈরি করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। এদেশের কতক বুদ্ধিজীবী এখন থেকেই মনঃস্থির করে বসে আছেন যে পাকিস্তান যেদিন তার পরমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাবে সেদিন ভারত তার পরমাণবিক শক্তিকে বোমা নির্মাণের কাজে লাগাবে। রইল পড়ে শান্তিপূর্ণ প্রয়োজনে ব্যবহার। যেন শান্তিপূর্ণ প্রয়োজনটা একটা ছল।

অসম্ভব নয় যে পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতও পরমাণবিক মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নামবে। তার ফলে সবাইকে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত থাকতে হবে কে জানে কখন কে কার উপর বোমা ফেলবে। বোমার পক্ষে যাঁরা তাঁদের যুক্তি হল, "আমাদেরও বোমা আছে জানলে ওরা বোমা ফেলতে সাহস পাবে না। নেই জানলে সাহস পাবেই।" কিন্তু ফেলবে কোথায়? দিল্লীতে, বোম্বেতে, শ্রীনগরে? যেখানে ফেলবে সেখানে যে কেবল হিন্দুই আছে তা নয়, মুসলমানও আছে। মুসলমানকে মারতে সাহস হবে কি? বলা যায় না—ইরান ইরাক উভয় পক্ষই তো প্রায় সাত বছর ধরে মুসলমান হয়ে মুসলমানকে মারছে। অন্যান্য মুসলমানরা তাদের থামাতে পারছে না। পাকিস্তানি মুসলমানরা যদি ভারতীয় মুসলমান-দের মারে তবে সেটা নজিরবিহীন হবে না। কিন্তু পরমাণবিক বোমা তো শুধু মানুষ মেরেই ক্ষান্ত নয়। সে তার পূর্বপুরুষদের কীর্তিও ধ্বংস করে। যে কীর্তির পুনর্নির্মাণ অসম্ভব। দিল্লী ধ্বংস হলে কুতব মিনার, লাল কেল্লা ইত্যাদিও ধ্বংস হবে।

বদলা দিতে গিয়ে ভারতের বৈমানিকরা হয়তো হরপ্পা ও মোহেন্‌জোদড়ো নিশ্চিহ্ন করে বসবে। চার-পাঁচ হাজার বছর ধরে যা অস্তিত্ব রক্ষা করেছে তার অস্তিত্ব লোপ পাবে। পাকিস্তানের কী? সে তো ইসলামপূর্ব সভ্যতার উত্তরাধিকারকে আপনার মনে করে না। কিন্তু ভারত যদি তার প্রাচীনতম উত্তরাধিকারকে নিজের বোমায় বিলুপ্ত করে তবে অনুশোচনার অবধি থাকবে না। তা ছাড়া পাকিস্তানে হিন্দু বড়ো একটা না থাকলেও তাদের পুরাকীর্তি তো বড়ো কম নেই। যেখানেই বোমা পড়বে সেখানেই

কিছু না কিছু পুরাকীর্তি ধ্বংস হবে। ব্যতিক্রম অবশ্য ইসলামাবাদের মতো আনকোরা নতুন শহর। তা ছাড়া পাঠানরা বরাবরই কংগ্রেসে ছিল। তারা ভারতের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন। তাদের কীর্তিই বা নষ্ট হবে কেন? বেলুচদের সম্বন্ধেও সেকথা খাটে।

তার চেয়ে বড়ো কথা, লাহোরের মুসলিম কীর্তিও কি ভারতীয় মুসলমানদের উত্তরাধিকার নয়? শুধু মুসলমান কেন, হিন্দুরাও যদি সত্যিকার ভারতীয় হয়ে থাকে তবে নুরজাহানের স্মৃতিসৌধ তাদেরও ভারতীয় উত্তরাধিকার। মমতাজের 'স্মৃতিসৌধ' সযত্নে রক্ষা করবে আর নুরজাহানের স্মৃতিসৌধ অন্ধ হয়ে নাশ করবে, এটা ভারতীয় মানসিকতা নয়। ভালোর জন্যেই হোক আর মন্দের জন্যেই হোক, আমরা সাতশো বছর একসঙ্গে বাস করেছি। সিন্ধুপ্রদেশকে হিসাবের মধ্যে ধরলে বারো শো বছর। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক রুশ-মারকিন সম্পর্কের সঙ্গে তুলনীয় নয়। রুশ উত্তরাধিকার মারকিন উত্তরাধিকার নয়। মারকিন উত্তরাধিকারও নয় রুশ উত্তরাধিকার। তারা যদি মানবিক উত্তরাধিকারে বিশ্বাস করে তবে তারা কখনই এক অপরের পুরাকীর্তি বা প্রিয় কীর্তি ধূলিসাৎ করবে না। কিন্তু যুদ্ধকালে কারই বা মাথার ঠিক থাকে? শত্রুপক্ষের মনোবল ভাঙতে হলে তার প্রাণের জিনিসও ভাঙতে হয়। তাকে ভয় দেখাতে হয় যে হিরোশিমা আর নাগাসাকির পর আসছে কিয়োতো আর নারা। বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ না করলে জাপান তার অতি পুরাতন আর অতি প্রিয় উত্তরাধিকার হারাত। জাপ-মারকিন সম্পর্ক চির-কালের মতো ছিন্ন হত। জাপানের ক্ষতি যা হয়েছে তা উত্তরাধিকারঘটিত নয়।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি যতদূর হয়েছে তার চেয়ে বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং যুদ্ধ বাধলেও সে যুদ্ধ যেন পরমাণবিক অস্ত্রবিবর্জিত হয়। এটা হল আশার কথা। আশঙ্কার কথা এই যে, সাধারণ অস্ত্রে ভারত পাকিস্তানের চেয়ে শক্তিশালী হলে যা হবে, পাকিস্তানের হাতে পরমাণবিক অস্ত্র থাকলে সে হবে ভারতের চেয়ে শক্তিশালী। সে জিতে যেতেও পারে। সবচেয়ে ভালো যুদ্ধ না বাধা। যুদ্ধ যাতে না বাধে তার জন্যে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পাল্টা বোমা নির্মাণের চেষ্টা তার সঙ্গে খাপ খায় না। পাকিস্তান চরম ক্ষতি করলেও ভারত তার চরম ক্ষতি করবে না। যুদ্ধ জয় করাটাই আসল। পাল্টা ক্ষতি করাটা আসল নয়।

বার বার যুদ্ধবিরতির পর আর যুদ্ধবিরতি নয়। যুদ্ধ না বাধাই শ্রেয়, কিন্তু যদি বাধে তবে সন্ধি না হওয়া পর্যন্ত লড়তে হবে। এ ছাড়া তৃতীয় কোনো বিকল্প নেই। ক্ষয়ক্ষতির জন্যে মনটাকে প্রস্তুত করতে হবে। কিন্তু যে ক্ষতি অপূরণীয় সে ক্ষতি এড়াতেই হবে। যেমন উত্তরাধিকারের ক্ষতি। মুসলমানের কীর্তিও হিন্দুর উত্তরাধিকার। হিন্দুর কীর্তিও মুসলমানের।

যুদ্ধ যারা করে তাদের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। পাকিস্তানের কাছে ভারতের কোনো পাওনা নেই। ভারত পাকিস্তানের কোনো অংশ চায় না। সুতরাং ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাবে না। যুদ্ধ যদি কেউ বাধায় তো সে পাকিস্তান। তার মতে তার পাওনা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য। যেহেতু সে রাজ্যে মুসলিম সংখ্যাধিক্য। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীর একটি জোড়াতালিদেওয়া রাজ্য। জম্মু কোনো কালেই কাশ্মীরের অঙ্গ ছিল না। কাশ্মীরও ছিল না জম্মুর অঙ্গ। জম্মুর রাজা ইংরেজদের কাছ থেকে কাশ্মীর কিনে নেন। কাশ্মীরিদের ভোটে জম্মুর নিয়তি নির্ধারিত হতে পারে না। তেমনি, জম্মুর অধিবাসীদের ভোটে কাশ্মীরিদের নিয়তি। লাদাখ বলে আরো একটি খণ্ড আছে। সেখানকার লোক তিব্বতের লোকের জ্ঞাতি। মুসলমানদের সংখ্যা যদিও বৌদ্ধদের চেয়ে বেশি মুসলমানরাও তাদের স্বজাতি। স্থানীয় বৌদ্ধদের সঙ্গেই তাদের মিল বেশি। রেফারেনডাম যদি তিন ভাগে হয় তবে জম্মু তথা লাদাখের অধিবাসীরা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেবে না। হয় ভারতের পক্ষে ভোট দেবে, নয় স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পক্ষে। বাকি থাকে কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসীরা। তাদের অধিকাংশই মুসলমান, কিন্তু মুসলমানদের সকলেই কিন্তু পাকিস্তানপন্থী নয়। কতক লোক যে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেবে এটা ঠিক কিন্তু কতক লোক চায় স্বাধীন কাশ্মীর। বাকি যারা তারা ভারতেই থাকতে ইচ্ছুক। ভারতে থেকে তারা একটা স্বতন্ত্র সংবিধান রচনা করতে পেরেছে। পাকিস্তানে গেলে সেরকম একটা স্বতন্ত্র সংবিধান রচনা করার অধিকার পেত না। বাংলাদেশের মুসলমানরা যে-কারণে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে গেল, কাশ্মীরি মুসলমানরাও সেই কারণে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাংলা-দেশের মতোই স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইত। কিন্তু সে রাষ্ট্রে জম্মু আর লাদাখ না থাকলে সে রাষ্ট্র নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারত না। বাধ্য হয়ে তাকে ভারত বা পাকিস্তান এদের একটার সঙ্গে যোগ দিতে হতই। পাকিস্তান কি ভারতের মতো স্বতন্ত্র সংবিধান রচনার অধিকার দিত? মনে তো হয় না। সুতরাং কাশ্মীরকে ভারতেই যোগদান করতে হত।

কাশ্মীর বলতে আমি সমগ্র কাশ্মীরই বুঝেছি। অর্ধেক কাশ্মীর কিন্তু পাকিস্তানের দখলে। পাকিস্তান তাকে স্বতন্ত্র সংবিধান রচনা করতে দেয় নি। অথচ সে পুরোপুরি পাকিস্তানের অঙ্গীভূতও হয় নি। সমস্যাটা আসলে ভারতীয় কাশ্মীরের নয়, পাকিস্তানি কাশ্মীরের। এ সমস্যার সমাধান ভারতের হাতে নয়। ভারত পাকিস্তানের দখল মেনে না নিলেও পাকিস্তানকে বেদখল করতে আগ্রহী নয়। পাকিস্তান কিন্তু ভারতকে বেদখল করতে আগ্রহী। যুদ্ধের দ্বারা এর নিষ্পত্তি কি সম্ভবপর? মনে তো হয় না। নিষ্পত্তি যদি হয় তো শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই হবে। তৃতীয় পক্ষ যদি পাকিস্তানকে মদত না দিত তবে নিষ্পত্তি অনেক আগেই হতে পারত। ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার নীতি অনুসারে পাকিস্তানকে মদত দেওয়া চল্লিশ বছর ধরে চলে আসছে। হয়তো আরো চল্লিশ বছর ধরে চলতে থাকবে। যদি না পাকিস্তানের জনমত শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যে ভারতের সঙ্গে একমত হয়। অথবা তৃতীয় পক্ষের মতি পরিবর্তন হয়।

পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল তৎকালীন ভারতের সমুদয় মুসলমানের স্বার্থে। কিন্তু সৃষ্টির পর শতকরা চল্লিশজন মুসলমান খণ্ডিত ভারতেই রয়ে গেল। পাকিস্তান হল কার্যত শতকরা ষাটজন মুসলমানের স্বার্থে। চব্বিশ বছর বাদে বাংলাদেশ আলাদা হয়ে যায়। ফলে অবশিষ্ট পাকিস্তানে যারা থাকে তারা সমগ্র পাকিস্তান যাদের জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল সেই সর্ব-ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের শতকরা ত্রিশ জনেরও কম। এখন খণ্ডিত ভারতের মুসলমান-সংখ্যা খণ্ডিত পাকিস্তানের মুসলমান-সংখ্যার চেয়ে বেশি। পাকিস্তান আর দাবি করতে পারে না সে সারা উপমহাদেশের সমুদয় মুসলমানের স্বার্থের প্রহরী। পাকিস্তানি মুসলমানের স্বার্থ আর বাংলাদেশের মুসলমানের স্বার্থ যে এক নয় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ কয়েক লক্ষ বিহারী মুসলমান না পারছে পাকিস্তানে যেতে, না পারছে বাংলাদেশে থাকতে। তেমনি, পাকিস্তানি মুসলমানের স্বার্থ আর আজকের দিনের ভারতীয় মুসলমানের স্বার্থ এক নয়। হিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এরা কেউ যদি পাকিস্তানে পাড়ি দিতে চায় তো পাকিস্তান ভিসা দেবে না। ভিসা না নিয়ে ঢুকলে ফিরিয়ে দেবে।

পাকিস্তান-সৃষ্টির পর যেসব মুসলমান ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ছেড়ে পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস করে তাদের বেশির ভাগের অবস্থান করাচী শহরে তথা সিন্ধু-প্রদেশে। তাদের ভাষা উর্দু। সিন্ধীদের ভাষা সিন্ধী। ভাষাঘটিত দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো ভাষাকে ঢাকা হয় ধর্ম দিয়ে। পাকিস্তান বনে যায় পুরোদস্তুর ইসলামী রাষ্ট্র। কায়দে আজম জিন্নাহ আমলে ছিল মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্র নয় জিন্না তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকার দুই-

তৃতীয়াংশ সবুজ রেখে এক-তৃতীয়াংশ সফেদ করেন অমুসলমানদের খাতিরে। শুধুমাত্র মুসলমানদের নিয়ে পাকিস্তান তার প্রতিষ্ঠাকালের ঘোষণার বাইরে। ভাষাঘটিত বিরোধের সূত্রপাত দেখে শাসকদের উচিত ছিল তার সমাধান হিসাবে ফেডারেশন প্রবর্তন। ফেডারল স্টেট অভ পাকিস্তান হলেই সিন্ধী, পাঠান, বেলুচ প্রভৃতি সকলেই যে যার প্রদেশে অটোনমি পেত। তা হলে হয়তো বাংলাদেশও পাকিস্তানের শামিল হয়ে সন্তুষ্ট থাকত।

ফেডারেশন হয় নি, তার বদলে হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র। তাতে আমাদের কী আসে যায়? পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করব না। কিন্তু পরমাণবিক বোমা কেউ ঘরোয়া ব্যবহারের জন্যে বানায় না। বানায় পরের উপর ফেলার জন্যেই। সেই পর যদি ভারত হয়ে থাকে তবে সে তো আপত্তি করবেই। পরে হয়তো আফগানিস্তানও আপত্তি করবে। সোভিয়েট ইউনিয়নও। মারকিন পরমাণবিক বোমা জারমানির জন্যে উদ্দিষ্ট হলেও পড়ে জাপানের মাথায়। পাকিস্তানি পরমাণবিক বোমা ভারতের জন্যে উদ্দিষ্ট হলেও পড়তে পারে একদিন ইসরায়েলের মাথায়। ওর নাম রাখা হয়েছে ইসলামিক বম্। ইসলামের এক নম্বর দুশমন হিন্দু নয়, ইহুদী। লিবিয়া যদি অর্থসাহায্য করে থাকে তবে ইসরায়েলের কথা ভেবেই করেছে। কিন্তু আমি বিস্মিত হব না, যদি দেখি ইসলামী বোমা ইসলামকেই লক্ষ্যবস্তু করেছে। রাজনীতি ধর্মনীতি নয়।

ইণ্ডোনেশিয়াও মুসলমান, মালয়ও মুসলমান। তখনো মালয়েশিয়া নামকরণ হয় নি, কী জানি কী কারণে ইণ্ডোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ মালয়ের উপর খেপে যান। বলেন পরমাণবিক বোমা ফেলবেন। ভাগ্যিস, তাঁর হাতে তখন সে বোমা ছিল না। থাকলে কী ভয়ানক কাণ্ড হত! পারমাণবিক অস্ত্র যার তার হাতে পড়া বিচিত্র নয়। কথায় কথায় হাত থেকে ফেলাও বিচিত্র নয়। মুসলমান যে মুসলমানকে রেহাই দেবে এটা মোহ। ইরানের বা ইরাকের হাতে যদি পারমাণবিক বোমা থাকত তবে তাড়াতাড়ি যুদ্ধজয়ের প্রলোভনে ওদের এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর সে বোমা নিক্ষেপ করত। অবশ্য দোহাই দিত ইসলামের।

ইসলামী দুনিয়ার মহা দুশমন ইসরায়েল। আর আয়াতোল্লা খোমেইনীর বিচারে মহা শয়তান আমেরিকা। মহা দুশমনের মারফত মহা শয়তানের কাছ থেকে অস্ত্র কিনেছে ইরান। ইরানের নির্দেশে মহা শয়তানের দেশের দুই অপহৃত নাগরিককে মুক্তি দিয়েছে লেবাননের শিয়া সন্ত্রাসবাদী ইসলামী জেহাদ। মহা শয়তানের তৈরি অস্ত্র দিয়ে ইসলামী ইরান ইরাকের মুসলমানদের বধ করেছে বা করবে। নদীর মোহনায় অবস্থিত গোটা তিনেক দ্বীপের মালিকানা নিয়ে মুসলমানে মুসলমানে লড়াই ইসলামী দুনিয়ার আরো চল্লিশটি রাষ্ট্র মিলে মিটিয়ে দিতে পারছে না। ধর্ম নয়, অর্থই এর মূলে। তৈল রফতানি সূত্রে অর্থলাভেচ্ছা।

কিন্তু মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে হলে ধর্মের মতো অহিফেন আর নেই। আমাদের স্বদেশেই আমরা তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি পানজাবে। দিনের পর দিন যারা অকাতরে নরহত্যা করে চলেছে তাদের প্রেরণা আসছে শিখ ধর্ম থেকে। ধর্মমন্দিরকে তারা করে তুলেছিল অস্ত্রাগার ও সেনানিবাস। ভারত সরকার হিন্দু সরকার নয়, ধর্মনিরপেক্ষ সরকার। সশস্ত্র বিদ্রোহ বরদাস্ত করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্‌যোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হল। কারো কারো মতে আরো আগেই করা উচিত ছিল, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁরাই আবার উল্টে নালিশ করতেন যে লঘু পাপে গুরু দণ্ড হল। আমি বরাবরই বিশ্বাস করেছি যে পানজাবের সমস্যার কোনো সামরিক সমাধান নেই। খুঁজে বার করতে হবে রাজনৈতিক সমাধান। অপারেশন ব্লু স্টারের মাস কয়েক আগে একটি সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত করেছি এই

অভিমত। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ রাজনৈতিক সমাধানের নাগাল পান নি। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও সন্ত লঙ্গোয়ালের সমঝোতা কার্যকর হয় নি। আবার সেই সামরিক সমাধানের জন্যে সরকারের উপর চাপ পড়ছে। রোগের চেয়ে দাওয়াই আরো খারাপ। রাজীব গান্ধী পথ পরিবর্তন করবেন বলে মনে হয় না।

তেমনি, পরমাণবিক মারণাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি মাতা ও মাতামহের অনুবর্তী। ভারত যদি চীনের পরমাণবিক বোমার ভয়ে বিচলিত না হয়ে থাকে তবে পাকিস্তানের পরমাণবিক বোমার ভয়ে ভীত হবে কেন? চীনের বোমাই তো অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন। যেমন চীনের সঙ্গে তেমনি পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক নিষ্পত্তিই নিরাপত্তার গ্যারানটি। তার জন্যে যদি কিছু ছাড়তে হয় তো ছাড়তে হবে। নিতান্ত যদি মূলনীতিতে না বাধে। ভারতের মূলনীতি হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

খণ্ডিত ভারত অনায়াসেই হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারত। কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্রে হিন্দু ব্যতীত আর সকলেই হত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের নিয়ে ন্যাশনাল আরমি গঠন করা যায় না। মুসলমানদের না হয় বাদ দেওয়া গেল, কিন্তু শিখদের বাদ দিলে যুদ্ধকালে তাদের সাহায্য পাওয়া যেত না। পরবর্তী কালের অগ্নিপরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে সেরা সৈনিকদের কেউ বা পার্শী, কেউ বা খ্রীষ্টান, কেউ বা শিখ, কেউ বা অ্যাংলো-ইনডিয়ান। মুসলমানই বোধহয় সবার সেরা। এদেশ যদি ধর্মনিরপেক্ষ না হত তবে এরা কি প্রাণ দিয়ে লড়ত? পাকিস্তানের সৈন্যদলে মুসলিম ভিন্ন আর কেউ নেই। ইতিমধ্যে বোধহয় আহমদিয়াদেরও বিতাড়ন করা হয়েছে।

হিন্দু রাষ্ট্র হলে অচিরেই শিখ রাষ্ট্রের দাবি উঠত। শিখরা ব্রাহ্মণপ্রাধান্য মানে না। অতীতের হিন্দু ভারতে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য ছিল। রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজে বেশি। সেই ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের বিরুদ্ধেই শিখদের উত্থান। তাদের গুরুরা কেউ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। পুরোহিত বলতে যা বোঝায় শিখদের মধ্যে তা নেই। তারা দেবদেবী মানে না, জাতপাত মানে না, বেদ-পুরাণ মানে না। হিন্দু রাষ্ট্রে শিখরা বেখাপ। শিখ রাষ্ট্রে হিন্দুরা বেখাপ। মুসলিম রাষ্ট্রে হিন্দু শিখ উভয়েই বেখাপ। দেশভাগের সময় হিন্দু শিখ উভয়েই পাকিস্তান ত্যাগ করে। কিন্তু বছর কয়েক পরে দেখা যায়, পানজাবি হিন্দুরা পানজাবি ছেড়ে হিন্দিকেই তাদের মাতৃভাষা বলে প্রকাশ করেছে। আর গ্রহণ করেছে দেবনাগরী লিপি। অপরপক্ষে শিখরা পানজাবি ভাষা ও গুরুমুখী লিপির আঁচল ধরে আছে। ধর্ম দুই বলে ভাষাও দুই, লিপিও দুই। এই দুইয়েরই সম্প্রসারণ দুই স্বতন্ত্র প্রদেশ, দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের কল্পনা।

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন। গণতন্ত্রও নিরাপদ নয়, কারণ প্রার্থীরা যে যার সম্প্রদায়ের ভোটদাতাদের কাছে ধর্মের নামেই আবেদন করেন। দেশের বা দশের নামে নয়। নির্বাচিত সদস্যরা যদি যে যার সম্প্রদায়ির প্রতিনিধি হয়ে সাম্প্রদায়িক স্বার্থে কাজ করেন তো পক্ষপাতিত্ব অবশ্যম্ভাবী। এমন কয়েকটি দল আছে যারা প্রকাশ্যে না হলেও কার্যত সাম্প্রদায়িকতাবাদী। এমন কয়েকটি বহুলপ্রচারিত পত্রিকা আছে যারা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে নয়। এমনি একটি পত্রিকায় দেখি মথুরার কৃষ্ণজন্মভূমি বনাম মুসলমানদের ইদগা নিয়ে সচিত্র প্রবন্ধ। অযোধ্যার পর মথুরা। পরে এক পত্রলেখক কাশীও জুড়ে দেন। প্রত্যেকটিই বিস্ফোরক ইস্যু। বলা যেতে পারে আমাদের ঐতিহাসিক টাইম বম্। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিস্ফোরণের অপেক্ষায় রয়েছে। সতর্ক না হলে সর্বনাশ ডেকে আনবে। মূলনীতিতে অটল থাকা আমাদের সকলের কর্তব্য। ধর্মের নামে দেশের মানুষের মন ভেঙে দেওয়া দেশপ্রেম নয়। মনে ভাঙন ধরলে দেহেও ভাঙন ধরে। দেশের মানুষকে নিয়েই তো দেশ।

গাছগুলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

গাছগুলির শিকড়ে
সমস্ত শীতলতার প্রতিস্পর্ধী
এক উষ্ণতা
সঞ্চিত হয়ে আছে, যা
শীতের তুষারকে
ধীরে-ধীরে শরীর থেকে
একহাতে মুক্ত-নির্মোকের মতো
ফেলে দিয়ে
অন্যহাতে
হরিৎপাতার বাহার
এবং সদ্য-ফোটা ফুল দিয়ে
ঋতু বসন্তকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য
প্রস্তুত
শীতের মধ্যাহ্নে
দিবাবসানের আগেই।

আমাকেও চিন্তার মৌলে প্রবেশ করতে হবে
যেখানে মনের অগোচরে
জন্মমৃত্যুর মৌল সত্য
অভিন্ন : আশানিরাশার দ্বন্দ্ব
সম্পূর্ণ অতীত
এই গাছগুলির সঙ্গেও
সেখানে আমি পৌঁছে যেতে পারি।

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ভয়ের শীতলস্পর্শে
আমি একটি কুঁকড়ে-থাকা জন্তুর মতো
স্থির হয়ে বসে ছিলাম
আর এখন আমি নির্ভয়
সূর্যের আলোর মতো সর্বত্রসঞ্চারী
আর-এক নির্মোক পড়ুক খসে॥

শৃগালের সময়

শেখর আহ্‌মেদ

গভীর আঁধারে আছি শবসাধনায়।
আপন স্নায়ুর চিতা গাঢ় লেলিহান,
মাথার ওপরে আছে শকুনের পাখা
এবং তোমরা কিছু ধূর্ত শেয়াল
তফাতে জ্বেলেছ চোখ লুব্ধ ক্ষুধায়।
দেহ-নিংড়ানো কিছু রক্তের মদে
আমার করোটি ভরা—ঠোঁটের গোড়ায়।
চিতা-ঝলসানো কিছু স্বীয় মাংসের
তাল আছে প্রস্তুত।
এখন শৃগাল,
পরম ভকতনিধি শৃগালের দল,
সেবার লগ্ন বুঝি এল তোমাদের ;
চোয়ালের নামাবলি খুলে অচিরাৎ
এবার কুন্দদাঁতে করো তবে প্রেম বিতরণ।

দুটো কৃষ্ণসাগর

মধুসূদন পাল

আশ্চর্য সুন্দর তোমার চোখের ডানা দুটো
খুলে দিলে চমকে ওঠে পৃথিবী ;
মসকোয় ঘণ্টা বাজে
যেন দুটো কৃষ্ণসাগর যেন আঁধারে জ্যোৎস্নালোক
তখনো ভূমিকম্প হিরোসিমায়—আমার অলিন্দে।
কাজলাক্ষী মদিরায় আদিম কামনার অরণ্য-সরোবরে
হংসমিথুন হয় শুধু চকিত পলকে
ঐন্দ্রজালিক কারুকার্যে স্থাপত্যের নিদাঘ-শোভা
খেলে-খেলে যায় তোমার মায়াবী চোখে।

পটভূমি : সুন্দরবন

শৌনক বর্মণ

পেতে বসে আছ মায়াবী জাল
ধাতব কঠিন শহরের রহস্যময়তা ছেড়ে জীবন ছুটে যায়
ছুটে যায় কবন্ধ গেরস্থালি ছেড়ে !

এ কোন্ ছলনায় দেখালে তোমার বুকের হাহাকার
অর্কিড বেঁচে থাকা যার তাকে বলো নিঃসঙ্গতার কথা
বড়ো লোভ হয়, হা-মুখের কষ বেয়ে ঝরে যায় লালা
শ্রীহীন বুকের হাড়গুলো কেমন সোৎসাহে পুরুষ্ট হয়ে ওঠে।
এ কি তোমার গোপনীয়তা প্রকাশ পাথর সময় ভেঙে
যুদ্ধশেষের সন্ধিনিশান ?

চারপাশে এখন প্রবাহশীল বিরূপ সময়, তথাপি
নিত্য চোখের জল এখন অনিয়মিত আসে
ফিরে আসি বারবার পূর্ণ যুবক শূন্য কমণ্ডলু হাতে।

বৃত্তের বাইরে

আবুল হাসানাত

'বাসটার্ড', 'সন অব এ বিচ'! দাঁতে দাঁত ঘষে উচ্চারণ করলেন জোনাব আলী, একটি সংস্থার এম. ডি. যিনি নতুন এসেছেন, বিরাট ক্ষমতা আর প্রতাপ নিয়ে; যিনি সি. এস. পি. অফিসার হিসাবে এখনও, বাংলাদেশে, নিজেকে কৌলীন্যের এক সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থিত বলে মনে করে থাকেন। তিনি মানতে রাজি নন নিজেকে জনগণের সেবক বলে, বরং মনে করে থাকেন তিনি তাদের প্রভু। নিজের কর্মক্ষমতা আর কাজ বোঝার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস এবং অধীন অফিসারের বক্তব্য শুনতে রাজি, মানতে নন; তবে তাঁর মতের সঙ্গে যদি অন্যের বক্তব্য মিলে যায় তাহলে অবশ্য কোনো প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। কিন্তু এই অফিসারটি তাঁর কাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এ তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। অবিশ্বাস্য কাণ্ড, বলে কিনা—স্যার, ভেবে দেখি! আরে বাসটার্ড, তোর ভেবে দেখার দরকার কী। আমি আদেশ করেছি, তুই পালন করবি, ব্যস। ব্যাপারটি চুকেবুকে গেল—ভেবে দেখবার অবকাশ কোথায়!

না, একটা বিহিত করতে হবে। আলীসাহেব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ঘন-ঘন গোটা তিনেক ফাইভ খেয়ে মাথা যেন পরিষ্কার হচ্ছে বলে তাঁর মনে হয়। উত্তেজনা দমন করে রাখাই যে যথার্থ অফিসারের লক্ষণ এবং নিজেকে আড়াল করে রাখা যে বুদ্ধিমানের কর্তব্য, এ-ভাবনা মগজে সেঁধার পর খুব জোরে ঘণ্টি বাজান।

সালাম এসে দাঁড়াতেই গর্জে ওঠেন, শুনতে পাও না? এত দেরি কেন? পানি দাও।

বিমূঢ় পিয়নটি তাড়াতাড়ি করে কচি ডাবের পানি গ্লাসে ভরে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সামনে ধরে।

এই নিয়মটি আলীসাহেবই চালু করেছেন। তিনি এসেই দেখেন, এ সংস্থায়, পানি চাইলে পানিই দেয় এবং চা চাইলে চা। ওয়ট এ নন্‌সেনস! এরপর থেকে তিনি চা চাইলে কফি আর পানি চাইলে ডাব দেয়া হয়ে থাকে। অতিথি এলে চা আর বিসকুট।

ডাবের পানি সত্যিই ভালো—মেজাজে স্নিগ্ধতা আনে।

ওধারে অফিসে ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেছে। বরকতকে দু-একজন ছেঁকে ধরেছে ব্যাপারটি জানার জন্য। সে মুখ খোলে নি। কারণ, ইতিমধ্যে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে এম. ডি. এসব পছন্দ করেন না। তা ছাড়া, অফিসের কথা শোরগোল করে বলার কী আছে।

ফোন আগেই করেছিলেন আহমদ হোসেন। কাজেই 'নক' করে ঢুকে পড়লেন।

বিনয়ের হাস্যে উজ্জ্বল আলীসাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন, হোসেনসাহেব, আসুন।

হাত বাড়িয়ে দেন করমর্দনের জন্য।

শিক্ষিত বিজনেসম্যান আহমদ হোসেন। খুব পছন্দ আলীসাহেবের। অশিক্ষিত মূর্খদের তিনি একদম দেখতে পারেন না। তা ছাড়া, বলা নেই কওয়া নেই হুট করে ঢুকে যাওয়া দলের আর অ্যাপয়েনটমেনট ছাড়া দর্শনার্থীদের মতো না হওয়ায় হোসেনসাহেব তাঁর কাছে 'পারফেকট জেনট্যালম্যান', অবশ্য দুটো বয়সী লোকের 'বন্ধুত্ব' তো আর বাতাসে হয় না, সে তো জানা কথা—লেনদেন থাকবেই।

এ-কথা, সে-কথা, রাজনীতি সব শেষ করে কাজের কথা পাড়ার আগে বিবেচক আলীসাহেব বললেন, সব ঠিক হোসেনসাহেব, আশা করি কালকেই।

মৃদু হাসেন—সচেতন, দন্ত যেন বিকশিত হয়ে না পড়ে।

হোসেনসাহেব সিগারেটের ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন, আপনার সে অফিসার—

আলীসাহেব হোসেনের কথা শেষ করার ফুরসত দিলেন না। একজন প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বড়োকর্তার মতো মাথা নেড়ে চললেন, সব ঠিক আছে।

মনে-মনে হাসলেন আলীসাহেব। বরকত কত বড়ো সচিব তিনি দেখে নিয়েছেন। এ-সংস্থা সম্মানিত করার পর তিনি শুনেছিলেন তাঁর কথা—বড়ো কড়া, বিবেচক, আদর্শবাদী এবং সৎ।

পঞ্চাশ বছরের জাঁদরেল অফিসার জোনাব আলী মনে-মনে হেসেছিলেন এসব কথা শুনে। কত দেখলেন জীবনে। সবাই বিড়ালের মতো, দুধ পেলেই খায়। আর রজতমুদ্রায় কে না দুর্বল হয়! বরকত তো চুনোপুঁটি। প্রকৃতপক্ষে এই আদর্শবাদিতা আর সততা সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা চমৎকারভাবে মাটিগন্ধী। তিনি একদিন ইঙ্গিতে তাঁর এক বন্ধুর কথা গল্পচ্ছলে বরকতকে বলেছিলেন:

আসলে জানেন কী বরকতসাহেব, আমরা সবাই সময়ের দাস; সুযোগের শিকার। ভালোভাবে খেতে-শুতে-পরতে কে চায় না বলুন? এই যে আমি, ক-টাকা বেতন পাই বলুন, ভাগ্যিস পিতার কিছু সঞ্চয় ছিল, নইলে—তিনি দেহে শিহরন তোলেন এক অজ্ঞাত আশঙ্কায়। তবে পুনরায় প্রসঙ্গটির খেই ধরে বলেন, তবে আমাদের ইচ্ছায় সব সময় সবকিছু পরিচালিত হয় না—এমন কি আমার জীবনও নয়। তাই ভাবি এ-জীবনে যা পাওয়ার তা পাওয়াই ভালো। এই নষ্ট সমাজে ভালোর কী দাম বলুন!

বরকতকে আলীসাহেব আর কতটুকু জ্ঞান দেবেন। তিক্ত অভিজ্ঞতায় সে সবই জানে। দিলারা ঝাড়ুনে মেয়ে, কম ঝাড়ে নি, এখনও—

গতকালের কথাটাই স্মরণ করতে পারে সে। পাশের বাড়ির মহিলা বেড়াতে এসেছিল। ঘরদোর দেখে বলেছিল, আপনি ভাই, খুব সিম্পল।

দিলারা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, আর কী যে বলে বসে মহিলা।

আপনি এখনও ফ্রিজ কেনেন নি ভাই, টিভি রঙিন নয়—আমার উনি বলেন, জীবন কদিন, ভোগ করে নাও—আর···

দিলারা জানে। ওর বাড়িতে সে বেড়াতে গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসেছে। সুসজ্জিত ড্রইংরুম—সোফা সেট কতই না দামি, রঙিন টিভি, ইয়া বড়ো এক ফ্রিজ—

আমার মনে হয়, ভাই, বাড়ি করার জন্য খুব টাকা জমাচ্ছেন।

বাড়ি? মাসের তৃতীয় সপ্তাহের নিদারুণ অবস্থার কথা স্মরণ করে দিলারা শিউরিয়ে ওঠে।

মৃদু হেসে বলে, ঠিকই বলেছেন আপা। আমার উনি বলেন, ইংরেজের গাড়ি, হিন্দুর বাড়ি, আর মুসলমানের হাঁড়ি—উনি বাড়ি করবেন, গাড়ি করবেন, তারপর···

মহিলা সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, খুবই বুদ্ধিমান আপনার স্বামী, তবুও···

বরকত অফিস থেকে ফিরতেই দিলারা ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘিনীর মতো। এত অপমান সে করবে, স্বামী হয়ে। কেন সে পারে না যা আর দশজন পারে। এত কষ্ট সে কেন দিচ্ছে তাকে। তার কী অধিকার আছে তাকে কষ্ট দেওয়ার। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে সে থাকবে না তো কেন বিয়ে-সাদি করে সংসার পাতল,—সন্ন্যাসী হলেই পারত।

বরকত মনে-মনে হেসেছিল। দিলারা জানে না, তাঁর এম. ডি. যে 'অফার' তাকে দিয়েছে তাতে তার টিভি, ফ্রিজ কেন, তার সঙ্গে একটি টু-ইন-ওয়ানও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সূর্য কি পশ্চিমে ওঠে!

আলীসাহেব প্রথম যেদিন অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হন, সেদিন লক্ষ করেন সচিব তাঁর অভ্যর্থনা-ভাষণে কেমন যেন একটা ইঙ্গিত করেন, তা এত সূক্ষ্ম যে ধরা যায় না; কিন্তু ধূর্ততায় তিনিও কম যান না। সেদিনের সভার শেষে সবাই চলে গেলে হিসাব-রক্ষণ-প্রধান মৃদু হেসে বলেছিল, আপনি স্যার নতুন এসেছেন। আপনার নেতৃত্ব আমাদের পথ দেখাবে।

আলীসাহেব খুশি হয়েছিলেন কথাটা শুনে; কিন্তু পরক্ষণেই ভেবেছিলেন দ্ব্যর্থবোধক বাণী-ভঙ্গি না তো যে, স্যার করে-কম্মে খাওয়ার সুযোগ দেবেন আশা করি। আর আপনি তো খাবেন। আপনার কথা জানি, স্যার। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, এই যা।

এর পরে একে-একে একা-একা আরো কয়েকজন অফিসার তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করে গেছে। সর্বশেষে এসেছিল পি. আর. ও. এবং সেই তাঁকে বলেছিল, সচিবসাহেব স্যার, 'ভেরি হার্ড নাট টু ক্র্যাক'।

মনে-মনে হাসেন জোনাব আলী। সব যে তিনি ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন তা বোধ করি এরা জানে না।

বেলায়েতের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া হয়ে গেছে বলেই বিশ্বাস। এবং তিনি নিশ্চিত, যেভাবে তাকে বলেছেন সেইভাবে নথি সে পেশ করবে। এবং এতে উভয়ের লাভ—বাঁচো এবং বাঁচতে দাও।

পি. এস.-কে ডেকে জিজ্ঞেস করার কথা ছিল না জোনাব আলীর, তবুও অফিস তাঁর অঙ্গুলিহেলনে চলছে কিনা পরখ করার জন্যে ডেকে পাঠালেন।

জী, স্যার।

বসুন।

পি. এস. হেমায়েত দাঁড়িয়ে থাকে এবং দুটি হাত কচলায়।

গাড়ি পাঠিয়েছেন স্কুলে?

জী, স্যার।

কলেজেও যেতে হবে।

স্কুল থেকে কলেজে যাবে, স্যার।

কিন্তু—

ওটা স্যার আমি ম্যানেজ করেছি। আর-একটি গাড়ি আছে—সচিবের—সেটা ভারসিটিতে যাবে। ছেলেমেয়ে সব ঘরে এসে যাবে, স্যার। ওই সময় আপনার মিটিং সেক্রেটারিয়েটে—তখন আপনার গাড়ি ফিরে আসবে।

ভেরি গুড। অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে পরিতৃপ্তির ধোঁয়া ছাড়েন এম. ডি.।

আচ্ছা, সচিবসাহেবের গাড়িটি ব্যবহার করছি—উনি—

না, স্যার উনি রাগ করবেন না।

আপনি জানেন কিভাবে?

উনি স্যার ভালো লোক, রাগ করেন না।

তাই?

জী স্যার।

তা ছাড়া—

থামলেন কেন? বলুন।

তা ছাড়া তিনি—ভালো স্যার—আমি ছিলাম কিনা—

আপনি ছিলেন মানে?

আমি স্যার ওর বাসায় ছিলাম একমাস। প্রথম, স্যার, এখানে চাকরি নিয়ে বাসার অভাবে বড়োই অসুবিধায় পড়েছিলাম। কী ভাবে যেন জেনে উনি আমাকে বললেন, হেমায়েতসাহেব, যদি আপনার অসুবিধা না হয় আমার বাসায় থাকুন—বাসা পেলে চলে যাবেন।

স্ট্রেনজ!

তা ছাড়া স্যার, এত বড়ো অফিসার, কিন্তু অহংকার নেই। আর যা সিম্পল থাকেন, স্যার।

কেন?

আয় বুঝে ব্যয় করেন।

ও!

মৃদু হাসেন জোনাব আলী। প্রকৃত সত্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। লোকটি আসলে ভীরু। সাহস করে কোনো কাজ করার ক্ষমতা নেই। এবং যেহেতু ভীরু সেজন্য আকাঙ্ক্ষার পাখা বড়ো ছোটো তাঁর; নইলে এযুগে ফ্রিজ-টিভি-ফোন-গাড়ি ইত্যাদি আধুনিক উপকরণাদি ছাড়া বাঁচা কি সম্ভব! এমনও হতে পারে ছোটোলোকের বাচ্চা—সেই চাষা-ভুষা থেকে এসেছে—শরাফতি নেই—তাঁর যেমন আভিজাত্য রয়েছে—খোদ সৈয়দ বংশ, তবুও জাহির করেন না, বিনয় আর নম্রতার জন্যে।

আচ্ছা আসুন—হেমায়েতকে বিদায় দেন আলী সাহেব।

হঠাৎ তাঁর খটকা লাগে। ভীরু বলে অবজ্ঞা করে বেলায়েতকে তিনি কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না তো। এত বড়ো 'ডিল'—একথোক বিরাট টাকা—শেষে—

শান্ত মনটা অশান্ত হয়ে ওঠে। তাঁর চোখ জ্বলতে থাকে, মুখে কঠোরতা—দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে।

তা ছাড়া উলটোপালটা হলে হেনার কাছেও মুখ দেখাতে পারবেন না। তার কত সাধ নিজের একটি সুন্দর 'কার' থাকবে। এতদিনে তিনি প্রায় সেটা গুছিয়ে ফেলেছেন—দাঁও তো বারবার আসে না—খুচরা মালপানি—তার জন্য তিনি চিন্তিত নন।

অবশ্য তাঁর এটাও মনে হয় যে তিনি সবকিছু নিয়ে অতিরিক্ত ভাবছেন। ব্যাপারটি হয়তো খুব সহজেই মিটে যাবে। তাঁর এত উদ্যোগের হয়তো কোনো অর্থই নেই। তাছাড়া বেলায়েত 'না' বলে নি। বরং অফিসের নানা সমস্যাদি আলোচনায় বলেছে, আমার মতের সঙ্গে হয়তো স্যার আপনার মতের মিল কখনও কখনও নাও হতে পারে; কিন্তু আপনার ডেসিশন ফাইনাল—এটা স্যার, আমি মনে করি অফিস ডিসিপ্লিন।

বেলায়েতের শত্রু কম নেই অফিসে। তারা আবার বলাবলি শুরু করল, এবার বাছাধন ঠাণ্ডা। দুর্বল এম. ডি. পেয়ে এতদিন খুব মাতব্বরি করেছে। এখন? জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে যাবে—সাধু সেজে বসে থাকা যাবে না। পানিতে নামব চুল ভেজাব না—উঁহু, ওসব হবে না।

ফোনটি বেজে উঠল।

জোনাব আলী আর একটি সিগারেট ধরালেন।

পি.এস. হেমায়েত জানাল, সাখাওয়াত সাহেব কথা বলছেন।

সাখাওয়াত তাঁর বন্ধু। মন্ত্রণালয় থেকে ফোন করেছেন। 'হ্যাল্লো' করা আর কী।

পরের দিন অফিসে এসে বসতে না বসতে আহমদ হোসেনের ফোন। আলীসাহেব মৃদু হেসে বললেন, রাত্রে ঘুমোন নি মনে হচ্ছে!

কথাটি সত্য। কিন্তু হোসেনসাহেব বললেন, না, খুব ভালো ঘুম হয়েছে। আর আপনি থাকতে

আমার আবার চিন্তা কী।

আরো কিছু কথা বলে আলীসাহেব ফোন ছেড়ে দিলেন। আহমদ হোসেন যে চিন্তিত তা তিনি বুঝতে পারছেন। আর হবেনই বা কেন! এত বড়ো 'ডিল'; কতগুলো টাকা তাঁকে অগ্রিম দিয়েছেন। তাই তিনিও যে চিন্তিত, সে-কথা অস্বীকার করেন কেমন করে। বরকতকে সত্যিই তাঁর ভয় হয়। সবাই বলে 'হার্ড নাট টু ক্র্যাক'—সেই পরিচয়ই যদি রাখে সে! তাহলে তিনি কী করবেন!

কিন্তু বরকতের সঙ্গে আলাপ করে তিনি সন্তুষ্ট। সে পরিষ্কার বলেছে, ফাইল আসুক, স্যার আমি দেখব। আর তিনি তাকে পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, এর বাস্তবায়নে তার পকেটে ভালো পরিমাণের টাকা ঢুকে যাবে। তখন তো তার মুখ চকচকই করেছিল। আর সেই মনোভাব থেকেই না তিনি বুঝে ফেলেছেন যে, এরা পানি পায় না বলেই পান করে না। নইলে কে মরুভূমিতে মরতে চায় বলুন। আজকের দুনিয়ায় কি টাকা ছাড়া বাঁচা যায়! বিশেষ করে বাংলাদেশে। আইনের সঙ্গে বাজারদরের তফাতটা যেখানে আকাশচুম্বী।

অনেকগুলো নথি টেবিলে জমা। এগুলো জমিয়ে রাখার অভ্যাস নেই আলীসাহেবের। আজ কিন্তু নথিগুলো নাড়াচাড়া করে তিনি বিরক্ত হয়ে একপাশে সরিয়ে দিলেন। ঈপ্সিত নথিটি আসছে না। তবে কি কোনোরকম শয়তানি করছে বেলায়েত! ভুরু কুঞ্চিত হয়ে পড়ে তাঁর। কপালে দুটো ভাঁজ পড়ে। ফরসা ধবধবে মুখটি লাল হয়ে ওঠে। ঘেমে যান। পাখা কি কম জোরে চলছে! আবার ভাবেন, না, তাই বা হবে কেন। বেলায়েতের বদমাইশি করার ফায়দা কী। নিজের হাতে কেউ কি হাত কাটে! একবার ভাবলেন সচিবকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেন নথিটি এখনও তাঁর কাছে এল না কেন। কিন্তু একথা ভাবতেও তাঁর অহংকারে লাগে। অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাতে গিয়ে যদি ফেঁসে যায় কাজটা। এমনও হতে পারে আরো দাঁও মারার জন্য সে ফাইলটি ধরে রাখছে। তাঁকে খেলাবে—কুশল শিকারি যেমন বড়শিতে মাছ গেঁথে খেলায়। হয়তো সে আরো ঘোড়েল মাছ—অফিসের সহকর্মীরা পুরোপুরি তাকে চেনে না। হয়তো সে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চায় না, একেবারে বাঘ শিকার।

জোনাব আলী ঘেমে ওঠেন। বেয়ারাকে পানি দিতে বলেন। এরপর একটি সিগারেট ধরান। এবং প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত বোধ করেন। সিগারেট শেষ—অথচ আজমের পাত্তা নেই। আজমই তাঁকে সরবরাহ করে থাকে। তিনি অন্য একটি সংস্থায় থাকতে তার এক ট পদোন্নতি দিয়েছিলেন—সেই যে আজম সিগারেট দেয়া শুরু করেছে তার আর বিরতি হয় নি। এ অফিসে থাকতে একবার এসেছিল। আর কি আসবে না? কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজি। হতেও পারে। ছোটোলোকের বাচ্চা আর চাষা-ভুষোর সন্তান; নমশূদ্র থেকে উদ্ভূত; তাঁর মতো আরব থেকে তো আসে নি। এখন সে জানছে তাঁর হাতে কোনো কাজ নেই। কিন্তু বাস্টার্ড জানে না, তিনি আবার মিনিসট্রিতে ফিরে যাবেন এবং ওই সংস্থা তাঁর মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকবে। তখন? কিন্তু সে-কথা থাক, আজম মরুকগে—এখন বেলায়েত কী করছে সেটাই বিবেচ্য। মানুষের কি কোনো বিবেচনা নেই? তাঁকে খামাখায় সাসপেন্সে রাখছে। আসলে লোকটা গভীর জলের মাছ।

অফিসে তাঁর সহকর্মীরা তাকে চিনতেই পারে নি। চিনতে পারে নি, কারণ, অ্যাভারেজ—গড়পড়তা মাপের মানুষের দলে বরকত বড়ো মাপের মানুষ। সে মুখোস পরে আছে, মুখোসের আড়ালে যে মুখ সে-মুখটির পরিচয় কেউই পায় নি। নইলে এ যুগে সতী-সাধ্বী রমণীর মতো সৎ, নির্লোভ মানুষ কোথা!

বেশ কয়েকজন অফিসার কাজে-কর্মে এম. ডি.-র ঘরে ঢুকল। তিনি তাদের প্রত্যেককে শর্টকাট বিদায় দিলেন। সিগারেট বাড়িয়ে দিলেও নিলেন না।

নিজের কর্মকীর্তির যে গালগল্প সুযোগ পেলেই করতেন, সেসব গল্পও করলেন না। 'কী হল স্যারের'—! সবারই এক প্রশ্ন।

আবার ঘরটি খালি। সামনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির উজ্জ্বল ঝকঝকে ছবি। একপাশে একটু দূরে ঘড়ি। তিনি আসনের পিছনে ছবি ও ঘড়ি ইচ্ছে করেই স্থাপন করেন নি। স্বকীয়তা বজায় রাখতে হবে। তাছাড়া তিনি মনে করেন 'স্টাইল ইজ দা ম্যান'।

ঘড়িটায় চোখ রেখে ভাবলেন বারোটা বাজে। আর দুঘণ্টা পর ছুটি। এমন সব অফিসার, এক মিনিটও অপেক্ষা করবে না। তাহলে? হঠাৎ তাঁর মনে হল লোকটি খুব রসিক। অন্তরঙ্গ কথাবার্তায় সে-পরিচয় তিনি ছিটেফোঁটা পেয়েছেন। তাই বরকত হয়তো তাঁকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য ঠিক দুটোর সময় নথি পাঠাবে। টেনশনে রাখল, কাজও হল। তিনি বিরক্ত খুশি দুইই হলেন; অথচ তাকে ধন্যবাদ জানানোর অবকাশ দিল না। পরমুহূর্তে আলী সাহেব ভাবলেন, তাই-ই বা করবে কেন বরকত। অফিসের কাজ তো গোয়েন্দা উপন্যাস নয় যে 'সাসপেন্স ক্রিয়েট' করতে হবে।

শেষে জোনাব আলী নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে ওঠেন। যত্তসব। একটা 'ডিল' মারা যায় যাবে। আবার আর-একটি হবে। আর বেলায়েতকে এমন চরম শিক্ষা দেবেন যে সে সারা জীবন তা স্মরণে রাখবে এবং বলবে, হ্যাঁ একটা এম. ডি. বটে।

কিন্তু তাতে তাঁর কী লাভ। কাজ তো উদ্ধার হল না।

এইরকম জটিল পরিস্থিতিতে তাঁর ফোন এল সচিবালয় থেকে; সচিব সাহেবের তলব।

সচিব সাহেব ডাকলে আলীসাহেব খুশিই হয়ে থাকেন। স্যারের সান্নিধ্যে আসার চমৎকার সুযোগ। তিনিও মন্ত্রণালয়ে গেলে সুযোগমতো সালাম দিয়ে আসেন। এগুলো তিনি দরকার বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু আজ? আজ স্যারের কাছে যাওয়ার কোনো 'আর্জই' তাঁর নেই। অথচ যেতেই হবে। অগত্যা তিনি জীবনে এই প্রথম ম্লানমুখে স্যারের সঙ্গে দেখা করার জন্য গাত্রোত্থান করলেন।

জোনাব আলীর অফিসে ফিরে আসতে একটু দেরিই হয়ে গেল। সারা অফিস খাঁ-খাঁ করছে ঠা-ঠা রোদের মতো; এবং অফিস বিলডিংটা বাজপড়া তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে। কেউ নেই অফিসে; কেবল তাঁর পিয়ন ও পি. এস. তখনও বাধ্য কুকুরের মতো প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছে। খুব খুশি হলেন জোনাব আলী। ঘরে ঢুকে তাকাতেই ঘড়ির পানে নজর গেল—আড়াইটা বাজছে—তিনি টেবিলের দিকে নজর দিলেন, অনেকগুলো নথি জমা হয়ে গেছে। খারাপই লাগল তাঁর—নথি টেবিলে জমিয়ে রাখা তিনি একদম পছন্দ করেন না। টেবিলের কাছে এসে চেয়ারে বসার আগে তিনি নথিগুলোর দিকে তাকাতেই তাঁর বুকটি ধড়াস করে ওঠে। কী আনন্দ, সেই ঈপ্সিত নথিটি! বেলায়েত তাহলে কাজ করেছে। যাক, বাঁচা গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন আলী সাহেব। এতক্ষণের চাপা-দম-দেয়া শরীরের বিড়ম্বনার যেন অবসান হল। চাপা-উত্তেজনা ও ভয়-ভেজ মান-সিকতার জন্য স্যারের সঙ্গেও আজ জমিয়ে কথা বলতে পারেন নি, অথচ করা উচিত ছিল তাঁর—সব-কিছুর মূলে যে নথিটি, সেটি তাঁর টেবিলে। বরকত কথা রেখেছে। আসলে লোকটি ভালো। দশজনে তাকে খারাপ বলে। তিনিও ভুল বুঝেছেন, এজন্য তাঁর আফসোসই হল। মানুষকে কি সহজে চেনা যায়! তা ছাড়া অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত বলে একটা কথা আছে। মিথ্যা কথা বলা পাপ, কিন্তু মৃত্যুর মুখে বলা পাপ নয়।

সিগারেট ধরিয়ে নথিটি দেখেই বাসায় ফিরবেন ভেবে সেটি টেনে নেন। ফিতা খুলে পৃষ্ঠা বের করে পড়তেই তিনি স্তম্ভিত হয়ে পড়েন—সম্পূর্ণ নেতি-বাচক মন্তব্য—এবং এতই স্পষ্ট ও জোরালো মন্তব্য বেলায়েতের যে, এ-নথিতে 'ডিলের' পক্ষে মন্তব্য

লেখা এম. ডি.-র পক্ষে কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়।

কলমটি তিনি যথাস্থানে রেখে দিলেন। সিগারেট ছাইদানিতে দিলেন ফেলে। ভেতরের সমস্ত উত্তেজনা এতক্ষণে যেন সমাপ্তি পেল। বিপদাশঙ্কায় যে ভয়, বিপদ ঘাড়ে এসে পড়লে সে-ভয় থাকে না। এত বড়ো প্রত্যাশা ভঙ্গ হওয়ায় জোনাব আলীর ওষ্ঠ-কোণে রহস্যময় হাসি খেলে প্রথম চাঁদের মতো মিলিয়ে গেল।

চোখ তুলে তাকাতেই সেই ঘড়ির দিকে জোনাব আলীর দৃষ্টি পড়ল। তাঁর মনে হল ওই ঘড়ি একদিন বন্ধ হয়ে যাবে, চলবে না আর, সময় দেখবে না কেউ আর তাকিয়ে এবং অফিসে-অফিসে তাঁর মতো অফিসার ঘুরে বেড়াবে; কিন্তু বেলায়েতেরা থাকবে সবসময় বৃত্তের বাইরে, এবং বৃত্তের বাইরে থেকে সব সময় সব অফিসের কাজে শৃঙ্খলা, আনুগত্য আর নিয়মের মুখে লাথি মারবে। এই নবনায়েবদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার বোধকরি কোনো উপায় নেই।

বাংলাদেশ

অনিবার্য মূল্যবৃদ্ধির চাপে
চতুরঙ্গের মূল্যবৃদ্ধি

সকল ক্ষেত্রেই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও চতুরঙ্গর প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন পাঠকদের কাছে পত্রিকাকে সুলভ রাখার প্রয়াস গত তিন বছর ধরে আমরা করে আসছি। কিন্তু এখন ব্যয়ভার সাধ্যাতিরিক্ত হয়ে পড়েছে। সেই কারণে আগামী মে ১৯৮৭ (৪৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) থেকে চতুরঙ্গর প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন টাকার পরিবর্তে **চার** টাকা করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি।

আশা করব, মূল্যবৃদ্ধিজনিত অবস্থার কথা বিবেচনা করে চতুরঙ্গর সহৃদয় পাঠকবর্গ তাঁদের শুভেচ্ছা আর সহানুভূতির মাত্রা আগের মতোই অটুট রাখবেন। ৪৮ বর্ষে গ্রাহক-চাঁদার হার: বার্ষিক ৪৫ টাকা, ষান্মাসিক ২৪ টাকা। চাঁদা হাতে-হাতে বা মনি অর্ডারে দেওয়াই উভয়ত সুবিধাজনক। কলকাতার ব্যাঙ্কের উপর চেক পাঠানো যেতে পারে—Antaranga Prakashani Private Limited-এর নামে। **কিন্তু কলকাতার বাইরের ব্যাঙ্কের কোনো চেক গ্রহণ করা সম্ভব নয়।**

তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা

সুনীল সেন

এরিক স্টোকস লিখেছেন, বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার জগতে বিপ্লব এসেছে, ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় কৃষকের প্রত্যাবর্তনে যে বিপ্লব প্রতিভাত। বিগত পনেরো বছরে দেশের বিদেশের অনেক পণ্ডিতের গবেষণার বিষয় কৃষকের জীবন, তার চেতনা, তার আন্দোলন। দেখবার ভঙ্গি অবশ্য সকলের একরকম নয়। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন জিজ্ঞাসা এবং ভাবাদর্শগত অবস্থান। মার্কসবাদীরা সামন্ততন্ত্রবিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবে কৃষক-সংগ্রামের বিপুল সম্ভাবনা আর গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; সেই সঙ্গে তাঁরা বলেছেন, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী বিনা কৃষকের একক আন্দোলন পরাজিত হয়। কৃষকসমাজের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় শ্রেণীবিভাগ (যেমন, ধনী কৃষক, মাঝারি কৃষক, গরিব কৃষক) মার্কসবাদী সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে। হামজা আলাভি কৃষকের তিনটি বর্গের ভূমিকা আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখেছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষক-সংগ্রামে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে মাঝারি কৃষক—ভূস্বামীর উপর নির্ভরশীল গরিব কৃষক বা খেতমজুর নয়। আমেরিকার সমাজতত্ত্ববিদ এরিক উলফ এই মতের সমর্থক। সম্প্রতি সাব-অলটার্ন্ (subaltern) মতবাদ পুরোভাগে এসেছে। এই মতবাদের প্রবক্তারা বলেন, কৃষক-আন্দোলন স্বতন্ত্র, স্বাধীন; নিম্নবর্গের মানুষ আন্দোলনের চালিকা শক্তি; অনেক সময় তাদের চেতনা এবং রাজনৈতিক সংকটের চাপে মধ্যবিত্ত নেতারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। রণজিৎ গুহের মতে, উনিশ শতকের সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং বীরসা মুণ্ডার পরিচালিত কৃষক-বিদ্রোহের সময় কৃষকদের মধ্যে "রাজনৈতিক চেতনা"র বিকাশ ঘটেছিল; বিদ্রোহী কৃষকরা জানতেন তাঁরা কী করতে যাচ্ছেন। আবার কিছু লেখক আছেন যাঁরা জাতীয়তাবাদী এবং কমিউনিসটদের দ্বারা পরিচালিত কৃষক-আন্দোলনের মধ্যে "সংস্কারবাদ" খোঁজেন; দুই "পারলামেনটারি কমিউনিসট পার্টি"-র সমালোচনা না করে এঁরা জলগ্রহণ করেন না।

এই প্রবন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচিত হবে না; এর মূল উদ্দেশ্য পশ্চিমবাঙলার কৃষক-আন্দোলনের ধারা এবং বৈশিষ্ট্যের আলোচনা। এই আলোচনা বিভিন্ন মতবাদের যাথার্থ্য অনুধাবন করতে হয়তো সাহায্য করবে। তেভাগা আন্দোলন দিয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে; নিঃসন্দেহে এটি বাঙলাদেশের বৃহত্তম গণ-আন্দোলন। তেভাগা আন্দোলনে প্রতিফলিত বর্গাদারদের প্রত্যাশা পূরণের আংশিক চেষ্টা অপারেশন বর্গা; অপারেশন বর্গার আলোচনা দিয়ে প্রবন্ধের সমাপ্তি। উপসংহারে আছে লেখকের কিছু মন্তব্য।

এক

গান্ধীপর্ব থেকে ভারতে কৃষক-আন্দোলনের সূচনা; জাতীয় আন্দোলনের অংশরূপে এবং তার ধাক্কায় কৃষক-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, গুজরাত, অন্ধ্র এবং বাঙলায়। জাতীয় আন্দোলনের স্রোত বেগবান হয়েছিল কৃষকদের সমর্থন পেয়ে; শহরে সীমাবদ্ধ থাকলে এই আন্দোলন অনিবার্যভাবে অকেজো হয়ে পড়ত। তবু কৃষকের সংগঠন গড়ে উঠেছে বিলম্বে। দুর্ভাগ্য এই দেশে নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম ১৯২০ সালে, আর সারা-ভারত কৃষকসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। অবশেষে জাতীয়তাবাদীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং বামপন্থীরা মিলে গঠন করলেন কৃষকদের কেন্দ্রীয় সংগঠন, প্রদেশে প্রদেশে যার শাখা স্থাপিত হল। কৃষক-আন্দোলনে এক নতুন কালপর্ব শুরু হল, যে পর্বে শতাব্দীর পুরনো সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকের শ্রেণীসংগ্রাম পুরোভাগে এল। তেভাগা আন্দোলন এবং তেলেঙ্গানায় কৃষকের সশস্ত্র বিপ্লব এই পর্বের ঘটনা।

কলকাতার বীভৎস দাঙ্গার তিন মাস পরে ১৯৪৬ সালের শরৎকালে তেভাগা আন্দোলনের শুরু। অবিভক্ত বাঙলার উনিশটি জেলায়—দিনাজপুর, রংপুর, মালদহ, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ, যশোহর, খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, চব্বিশপরগনা, বাঁকুড়া, বীরভূম—এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতা তখন শান্ত; গণতন্ত্রী আন্দোলন বিপর্যস্ত। নোয়াখালির পরে বিহারে দাঙ্গা ঘটে গেছে। কৃষকদের প্রধান ধ্বনি ছিল: নিজ খোলানে ধান তোলো; আধি নাই, তেভাগা চাই; লাঙল যার, জমি তার; বকেয়া ঋণ মকুব করো; জমিদারিপ্রথা ধ্বংস হোক। প্রায় একই সময়ে উত্তর ময়মনসিংহে হাজং কৃষকরা টংক আন্দোলন শুরু করেন, যার প্রধান দাবি ছিল টংক খাজনার পরিমাণ (বিঘায় ৭ থেকে ১৫ মন ধান) হ্রাস করা এবং টাকায় খাজনা দেয়ার বিধান। ১৯৪৭-এর ফেবরুয়ারির শেষে, হিংস্র দমননীতির মুখে আন্দোলন যখন ভেঙে পড়ছিল, তখনও সারওয়ার্দির বিবৃতিতে দিনাজপুর, ময়মনসিংহ আর জলপাইগুড়ি জেলায় চলমান তীব্র আন্দোলনের উল্লেখ আছে। তাঁর বিবৃতি পড়ে আন্দোলনের চরিত্র কিছু বোঝা যায়: 'সমান্তরাল বিচারের আদালত তৈরি করা হয়েছে, আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য লোককে আটক ও শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তিগত অপমান চালানো হচ্ছে। জমি চাষ করা হচ্ছে জোর করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জোতদারের পাশাপাশি। সংগঠিত করা হয়েছে সংগ্রাম কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, প্রচার ইশতাহার, গোপন আশ্রয়স্থল। ব্যাজ আর লাঠি দেওয়া হচ্ছে, স্বেচ্ছাসেবকদের ড্রিল আর প্যারেড শেখানো হচ্ছে।'

কমিউনিসটদের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষকসভা তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। বর্গাদারদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন এই আন্দোলনের ভিত্তি। চল্লিশের দশকে একদল বুদ্ধিজীবী আর মধ্যবিত্ত কমিউনিসট কর্মী গ্রামে গিয়েছিলেন রুশ নারদনিকের রোমানটিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নয়, কৃষক-আন্দোলনের নিবেদিত সংগঠকরূপে। বছরের পর বছর গ্রামে বাস করে তাঁরা কর্মে আর কথায় কৃষকদের আত্মীয়তা অর্জন করেছিলেন; তাঁরা তৈরি করেছিলেন কৃষক-কর্মীদের বাহিনী, যে কৃষক-কর্মীরা স্থানীয় নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল। সম্ভবত এটি আন্দোলনের অন্যতম স্থায়ী কৃতিত্ব। পরবর্তী কালেও সেদিনের কৃষক-কর্মীদের একটি অংশ গ্রামদেশে কৃষকসমিতি বাঁচিয়ে রেখেছিল। তেভাগা আন্দোলনের দুর্বলতা আর ব্যর্থতা প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে কিছু লেখক মধ্যবিত্ত নেতাদের দ্বিধা, সংস্কারবাদ আর দোদুল্যমানতার উল্লেখ করেছেন। বর্তমান লেখকের মতে, তেভাগা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যবিত্ত নেতাদের ইতিবাচক ভূমিকা অবিস্মরণীয়। পশ্চাৎপদ উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত গরিব কৃষকদের মধ্যে উন্নত চিন্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয় না; তাদের মধ্যে উন্নত চিন্তার বাহন বুদ্ধিজীবী।

অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত কয়েকটা জেলায়—দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, খুলনা আর যশোহরে—মুসলমান কৃষকদের যোগদান আন্দোলনএর একটি বৈশিষ্ট্য। ইতিপূর্বে (বা পরে) গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মুসলমান কৃষকদের এত ব্যাপক যোগদান চোখে পড়ে না। মনে হয়, প্রধানত মুসলমান কৃষকদের চাপে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা জানুয়ারি মাসের শেষে বর্গাদার বিল গেজেটে প্রকাশ করে। এই বিলে তেভাগার দাবি মূলত স্বীকৃত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের সমগ্র পর্বে বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষা ক'রে এই ধরনের বিল ইতিপূর্বে রচিত হয় নি। নিঃসন্দেহে বর্গাদার বিল অভিনব। বর্গাদার বিলের খবর গ্রামঅঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে আন্দোলনের পরিধি বিস্তৃত হয়; ইতিপূর্বে যারা জোতদারের খামারে ধান তুলেছিল, সুযোগ বুঝে তারা ধান নিয়ে আসে নিজেদের খামারে। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা এই বিল আইনসভায় পেশ করে নি; তারা আন্দোলনকে দমন করার নীতি অনুসরণ করে। আইনসভায় কোনো লীগ-নেতা বর্গাদার বিলের সমর্থনে কিছু বলেন নি। জলপাইগুড়ির কংগ্রেস নেতা খগেন দাশগুপ্ত ১০ই মার্চ বর্গাদার বিলের তীব্র সমালোচনা করে আইনসভায় বলেন: 'জেলায় জেলায় জোতদারদের গোলা পাঁচ-সাত হাজার লোক একত্র হয়ে আক্রমণ করছে···জোতদাররা থানায় এজাহার দিলে কোনো ফল হয় নি।' মাত্র এক সপ্তাহ আগে জলপাইগুড়ি জেলায় পুলিশের গুলিতে চারজন আদিবাসী কৃষক নিহত হয়েছিল; এই বক্তৃতার তিন সপ্তাহ পরে জলপাইগুড়িতে আবার গুলি চলে এবং নিহত হয় নয়জন আদিবাসী, এদের মধ্যে চা-বাগানের মজুরও ছিল। আইনসভায় সরকারি দমননীতির সমালোচনা করেন মাত্র দুজন সভ্য—জ্যোতি বসু এবং বীণা দাস (পরে গুহ)।

বর্গাদার বিল ধামাচাপা পড়লেও তেভাগা আন্দোলনকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভূমিরাজস্বমন্ত্রী ফজলুর রহমান জমিদারি উচ্ছেদ বিল পেশ করার কথা ঘোষণা করেন; ২১ এপ্রিল জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব বিল আইনসভায় উত্থাপিত হয়েছিল (বিলে অবশ্য তেভাগার দাবি স্বীকৃতি পায় নি)। সমসাময়িক সংবাদপত্রে জমিদারি উচ্ছেদ হয়েছিল আলোচ্য বিষয়। এই পটভূমিকায় কমিউনিসট নেতা ভবানী সেন "স্বাধীনতা" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বলেন, কৃষকসভার উচিত জমিদারি উচ্ছেদের জন্য ব্যাপকতর আন্দোলন গড়ে তোলা; সমস্ত বর্গের কৃষককে জাগিয়ে তুলতে পারে এই আন্দোলন। নিঃসন্দেহে দৃষ্টিভঙ্গিটা যুক্তিসংগত ছিল; তেভাগার দাবি শুধু বর্গাদারদের দাবি, সকল বর্গের কৃষকের দাবি নয়। মেদিনীপুরের পাঁচঘুড়ি গ্রামে অনুষ্ঠিত কৃষকসভার প্রাদেশিক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হল যে, জমিদারি উচ্ছেদের দাবি সামনে রেখে এপ্রিল মাস থেকে জমিদারদের খাস জমি দখলের সংগ্রাম শুরু করা হবে।

মুমূর্ষু কৃষক-সংগ্রামকে প্রেরণা দেবার জন্য শ্রমিক-সংগঠন তৎপর হল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ২৮ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট পালন করার আহ্বান জানায়। ২৭ মার্চ বিকেলে কলকাতায় নতুন করে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড শুরু হল; ২৮ মার্চ সৈন্য তলব করতে হল। এর প্রথম বলি হল প্রস্তাবিত সাধারণ ধর্মঘট; শিল্পাঞ্চলে শান্তি বজায় রাখা হল ট্রেড ইউনিয়নগুলির লক্ষ্য। খাস জমি দখলের প্রস্তাব আর রূপায়িত হল না। বর্গাদার বিল প্রকাশিত হবার পরে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে যে জঙ্গি মনোভাব দেখা গিয়েছিল তা তখন নিভন্ত। দাঙ্গা অব্যাহত থাকল স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন পর্যন্ত; শেষ পর্যন্ত দাঙ্গা থেমেছিল যাঁর চেষ্টায় তিনি গান্ধী।[১]

ঝড় থেমে গেল ঘটে, কিন্তু কিছুই আর আগের মতো হতে পারল না। কৃষকদের তীব্র অসন্তোষকে উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস সরকার পাস করল পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন, ১৯৫০; তারপর এল ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৫৫। মনে হয়, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কৃষক-সংগ্রামের সম্ভাবনা সম্বন্ধে নতুন চেতনা এল; এই চেতনার প্রকাশ দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত করার প্রস্তাব। প্রস্তাবে বলা হল, ভারতের "আজাদি ঝুটা হায়"; নেহরু সরকার ইঙ্গ-মারকিন ব্লকের সঙ্গে যুক্ত। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই অতি-বাম প্রস্তাব গ্রহণের জন্য পার্টিকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল; পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন অসংখ্য ক্যাডার। চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপ ছাড়া অন্যান্য জেলায় কৃষক-সংগ্রাম দেখা গেল না। মনে রাখা ভালো যে, সত্যিকারের কৃষক-সংগ্রাম পার্টির প্রস্তাবের উপর নির্ভর করে না। উপর থেকে চাপানো কৃষক-সংগ্রাম ভঙ্গুর।

তেভাগা আন্দোলনে কৃষক-মেয়েদের ব্যাপক যোগদানে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কমিউনিস্টরা। এই পর্বে তাঁরা কৃষক-মেয়েদের সভা আর মিছিলের পুরোভাগে রাখতেন; পুলিশের গুলিতে এত কৃষক-মহিলা ইতিপূর্বে নিহত হন নি। ১৯৪৯ সালের বসন্তে হাওড়া জেলার মসিলা গ্রামে তেভাগার দাবিতে মেয়েদের মিছিল হয়; পুলিশের গুলিতে নিহত হন চারজন মহিলা। শরৎকালে এই জেলার হাটাল গ্রামে দ্বিতীয়বার গুলি চলে, নিহত হন আটজন মহিলা, যাঁদের সবাই মাহিষ্য। হুগলি জেলার ডুবিরভেরিতে মেয়েদের মিছিলের উপর গুলিবর্ষণে ছয়জন মহিলার মৃত্যু হয়। কাকদ্বীপে নিহত হন সতেরো জন কৃষক, তার মধ্যে চারজন মহিলা। সম্প্রতি প্রকাশিত "দক্ষিণ বাংলার মাটিতে নতুন তেলেঙ্গানা" থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল: 'চব্বিশ পরগনা জেলার একেবারে দক্ষিণ মাথা, কাকদ্বীপ থানার শেষ, নীল মহাসমুদ্রের কোলে ষাটহাজার বিঘার লাট নারায়ণীতলা দ্বীপ, তারই একধারে মৌজা লয়ালগঞ্জ। ...কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে লয়ালগঞ্জের খেতমজুর আর ভাগচাষী...দিনের পর দিন প্রতিরোধ করছে।... পাঁচ হাজার বিঘা জমির ওপর প্রায় দুশো ঘর মানুষ কংগ্রেসি রাজত্বের আইনকানুনের বন্ধন ছিঁড়েকুটে বেরিয়ে এই এলাকাকে পুরানো শোষণ-ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছে।...মে দিবসের দিন থেকেই এই অঞ্চলে চারিদিকে কাছারি দখল করে ধান বিলি শুরু হয়েছিল...চার-চারটে কাছারি আর প্রায় পাঁচ হাজার বিঘা জমি আমরা পুরোপুরি দখল করেছি। দ্বারিকের কাছারি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছি। ওদের কাছারির গোরুবাছুর, বাসন, জিনিসপত্তর, শত শত মণ ধান সবই আমরা দখল করেছি।'[২]

সন্ত্রাসবাদের কানাগলিতে কাকদ্বীপের কৃষক-সংগ্রাম আটকে পড়ে; কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৫১ সালে তেলেঙ্গানা এবং কাকদ্বীপের সংগ্রাম প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয়, এবং ১৯৫২-র সাধারণ নির্বাচনে যোগ দেয়। দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব বাতিল করে কমিউনিস্ট পার্টি সংসদীয় পথ অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিল।

দুই

নেহরুপর্বের গোড়ায় কাকদ্বীপে (এবং তেলেঙ্গানায়) কৃষক-বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তী কালে দেশের কোনো অঞ্চলে কৃষক-বিদ্রোহ ঘটে নি। ঔপনিবেশিক পর্বে কৃষক-বিদ্রোহ প্রায় নিয়মিত ঘটেছিল ভারতের কোনো না কোনো অঞ্চলে; নেহরুপর্বে তা যেন অন্তর্হিত হল। এই প্রসঙ্গে ব্যারিংটন মুরের মতামত সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। মুর বলেছেন, ভারতের কৃষকের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার উৎস সন্ধান করতে হয় সামাজিক কাঠামোর মধ্যে; জাতিভেদপ্রথা অনিবার্যভাবে কৃষকের ধ্যানধারণাকে প্রভাবিত করে। উচ্চবর্ণের মানুষ ভূস্বামী; কৃষক কিন্তু "নীচু" জাত। নেহরুপর্বে কৃষির আধুনিকীকরণ অগ্রসর হল, যার সুবিধাভোগী সম্পন্ন কৃষক। কৃষকসমাজে এই শ্রেণী উচ্চ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত; গ্রামে এরাই নেহরু সরকারের প্রধান স্তম্ভ। এদের কাম্য স্থায়িত্ব, যা নেহরুপর্বে সারা দেশে এসেছে এবং অটুট থেকেছে।[৩]

নেহরুপর্বের আরো কিছু ঘটনা উল্লেখ করতে হয়। পঞ্চাশের দশকে জমিদারি আর জাগিরদারি প্রথার অবসান ঘটে; প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে ভূমিসংস্কার এবং প্রজার নিরাপত্তা বিধানের আইন চালু হয় (যদিও সীমাবদ্ধ ভাবে)। কৃষি এবং সেচ খাতে বিপুল অর্থ বরাদ্দ হয়; কয়েকটি অঞ্চলে বৃহৎ সেচপরিকল্পনা রূপায়িত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা, যার ভিত্তি মহলানবিশ মডেল, এই পর্বের স্মরণীয় ঘটনা। সকলের ভোটের অধিকার চালু হল। কৃষক আবিষ্কার করল তার নতুন শক্তি। গোয়ার মুক্তি ভারতের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্বে সাম্রাজ্যবাদ চুরচুর করে ভেঙে পড়ছিল; স্বাধীনতা যে আসন্ন, তা মানুষ বুঝতে পারছিল। নেহরুপর্বে পরিস্থিতি একেবারে পালটে গেল। একদিকে সদ্য-স্বাধীন দেশে জাতীয়তাবাদ মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল; অপরদিকে নেহরু সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন কৃষকের মধ্যে ছিল না। কৃষকদের মনে অসন্তোষ ছিল, ছোটো-ছোটো আঞ্চলিক আন্দোলনে তা প্রকাশিত হয়েছিল; কিন্তু কোনো কৃষক-বিদ্রোহ, এমন-কি জঙ্গি আন্দোলন ঘটে নি। পিছনের দিকে ফিরে তাকালে মনে হয়, কোন জঙ্গি আন্দোলনে কৃষকের সাড়া মেলে নি। কৃষক-আন্দোলনে যেন ভাটার টান শুরু হল। বিভিন্ন সাধারণ নির্বাচনে কৃষকের বিপুল সমর্থন যে কংগ্রেস দল পেল, তা দৈবাৎ ঘটনা নয়।

সারা-ভারত কৃষকসভার বার্ষিক সম্মেলনে (১৯৫৩ সাল) গৃহীত প্রস্তাব থেকে জানা যায়, ভূমিসংস্কার আইন পাশ হবার আগে ভূস্বামী শ্রেণী ব্যাপক প্রজা উচ্ছেদ করে তাদের জমি অধিকারের অভিযান শুরু করেছিল; উচ্ছেদ বন্ধ করা ছিল কৃষক-সভার আশু দায়িত্ব। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উচ্ছেদের হিড়িক দেখে একটি জরুরি আইন জারি করে, যার ফলে প্রজাদের উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হয়। পরের বছর জরুরি আইনের মেয়াদ শেষ হলে আন্দোলনে ভাটা আসে। সত্যিকার ভূমিসংস্কার, উচ্ছেদ বন্ধ করা, ফসলের লাভজনক দর, পর্যাপ্ত কৃষিঋণ প্রভৃতি দাবি নিয়ে কৃষকসভা অবিরাম প্রচারমূলক আন্দোলন সংগঠিত করে; সরকারের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষে তাঁরা লিপ্ত হন নি। ১৯৫৯ সালের গ্রীষ্মকালে গ্রাম থেকে খাদ্যের দাবিতে মিছিল আসে কলকাতা শহরে। পুলিশের গুলিবর্ষণে ৮০ জন নিহত হন শহরে এবং বিভিন্ন জেলায়। আইনসভায় প্রফুল্লচন্দ্র সেন অবিচলিতভাবে বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেই হবে। দমননীতির আঘাতে কৃষক-আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে; সভা আর মিছিলের মধ্যে কৃষকসভার কাজ সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে আইনসভায় কমিউনিস্টদের আসনসংখ্যা হয় ৭২; ১৯৫২ সালে

আসনসংখ্যা ছিল ৩৯। কৃষক-সাধারণ যে কংগ্রেস দলকেই সমর্থন করছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

তিন

অবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা ১৯৬৭-৬৯ পর্বে। কৃষক-আন্দোলনে আবার জোয়ার এল। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতের কয়েকটি রাজ্যে কৃষক আর খেতমজুরের ধর্মঘট এবং জমি-দখল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তের বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো কৃষকের তীব্র অসন্তোষ প্রতিফলিত হল এই অসাধারণ আন্দোলনে। স্বরাষ্ট্র-বিভাগের বিবৃতি থেকে জমি দখলের ঘটনার সংখ্যা জানা যায়: আসাম (৫), অন্ধ্র (৫), বিহার (২), গুজরাত (১), কেরল (৩), মধ্যপ্রদেশ (৫), মহারাষ্ট্র (১), মহীশূর (১), ওড়িষা (৩), পানজাব (৩), তামিলনাড়ু (২), উত্তরপ্রদেশ (৫); পশ্চিমবঙ্গে জমিদখলের ঘটনার সংখ্যা ৩৪৬, আর জমির পরিমাণ ৩ লক্ষ একর। রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭-এর পরে এই প্রথম বিভিন্ন রাজ্যে গঠিত হয়েছিল অ-কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা। এই প্রথম কৃষকদের একটি বড়ো অংশ কংগ্রেসকে সমর্থন করে নি; কায়েমি স্বার্থের শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানাল। এই নতুন কাল-পর্বের প্রতীক নকশালবাড়ি, যেখানে এক কৃষক-বিদ্রোহ পরিচালিত করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়েছিল। চীনের মডেল অনুসরণ করে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি ছিল নকশালপন্থীদের উদ্দেশ্য।

১৯৬৭ সালে বামপন্থী দলগুলি বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুক্তফ্রনট মন্ত্রিসভা গঠন করে। এই বছরের গ্রীষ্মকালে নকশালবাড়ি অঞ্চলে মজুত উদ্ধার এবং জোর করে জমি চাষ করা শুরু হয়। ২৪ মে পুলিশ আর কৃষকদের সংঘর্ষে সংগম ওয়াংদি নামে একজন পুলিশ অফিসার নিহত হন; পরের দিন কৃষক মিছিল গ্রাম পরিক্রমা করে; পুলিশের গুলি-বর্ষণে নয়জন কৃষক মারা যান। তাঁদের মধ্যে সাত-জনই মহিলা যাঁরা আদিবাসী এবং রাজবংশী। বুয়াগঞ্জ গ্রাম মুক্তাঞ্চল বলে ঘোষিত হয়; ১০ই জুন জোতদার নগেন রায়চৌধুরী নিহত হন। কানু সান্যাল লিখেছেন, কৃষকসভার সভ্যসংখ্যা ৫,০০০ থেকে বেড়ে ৪০,০০০ হল এবং প্রায় বিশ হাজার কৃষক হলেন সর্বক্ষণের কর্মী। গ্রাম কমিটি জমি-বণ্টনের পরিকল্পনা রূপায়িত করল; জোতদারদের ধান, বলদ, চাষের যন্ত্রপাতি দখল করা হল। জুলাই মাসে আন্দোলনের কিংবদন্তী নেতা জঙ্গল সাঁওতাল এবং আরো কয়েকজন নেতা গ্রেফতার হন; কানু সান্যাল আত্মগোপন করেন, কিন্তু ১৯৬৮-র অকটোবরে ধরা পড়েন। ইতিমধ্যে গণসংগ্রাম ভেঙে পড়েছিল; ১৯৬৯-৭০ পর্বে গণসংগ্রাম যে পরিমাণে মুমূর্ষু হল সেই পরিমাণে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পুরোভাগে এল। তখন নকশালবাদী আন্দোলনের ভাবমূর্তি ম্লান, বিবর্ণ। গ্রাম নয়, শহর হল "বিদ্রোহের" কেন্দ্র, যার পিছনে ছিল ছাত্রসমাজ।[৪]

১৯৬৯ সালের ফেবরুয়ারিতে যে নির্বাচন হল তাতে কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ৫৫টি আসন; দ্বিতীয় যুক্তফ্রনট মন্ত্রিসভা গঠিত হল। মে মাসে শুরু হল বেনাম জমি দখলের রাজ্যব্যাপী গণ-আন্দোলন, যা তীব্র হয়েছিল ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি এবং পশ্চিমদিনাজপুরে। ২৪ পরগনায় কৃষকরা দখল করেছিলেন প্রায় ৮৫ হাজার একর বেনাম জমি, আইনকে ফাঁকি দিয়ে জোতদাররা এতকাল যে জমি নিজেদের দখলে রেখেছিল। এই আন্দোলনের সাধারণ রূপ বোঝাবার জন্য আমরা ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত সোনারপুরের কথা বলব। রাজ্যব্যাপী জমি-দখল সংগ্রামের কোনো বড়ো লেখা (ম্যাক্রো স্টাডি) এখনো প্রকাশিত হয় নি।

সোনারপুরে তেভাগা আন্দোলন হয় নি। ১৯৪৮-৪৯ সালে অতি-বাম নীতির সমর্থক কমিউনিসটরা জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তুলবার চেষ্টা করেন; পুলিশের গুলিতে নিহত হন দুজন কৃষক। কিন্তু কৃষকসমিতির প্রভাব হ্রাস পায় নি। ১৯৫২ এবং ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে স্থানীয় কৃষকনেতা গঙ্গাধর নস্কর আইন-সভায় নির্বাচিত হন। ১৯৬৭-৬৯ পর্বে জমি-দখলের আন্দোলন বিস্তৃত হয় গ্রামে-গ্রামে; ১৯৬৯-এর জুন মাসের মধ্যে আট হাজার একর জমি দখল করা হয়। মাঠে ঝাণ্ডা উড়িয়ে কৃষকসভার স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী ধান কেটে বেনাম জমি দখল করে; কৃষক-মেয়েরাও আন্দোলনে যোগ দেন, যাদের একটি অংশ আদিবাসী। প্রায় একই সময় মাছের ভেড়ি দখলের আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভূস্বামীরা সোনারপুর, ভাঙ্গর, ক্যানিং, হাড়োয়া, সন্দেশখালি এবং মথুরাপুরে প্রায় ৩১ হাজার একর জমিতে মাছের ভেড়ি তৈরি করে ব্যাবসা চালাতেন। সোনারপুর এবং ভাঙ্গরে কৃষকরা ভেড়ি কেটে জল সরিয়ে দিয়ে মাছ এবং জমি দখল করে। কৃষকদের জঙ্গি মনোভাবের মুখে লক্ষপতি ভূস্বামীদের দ্রুত পশ্চাদপসরণ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। আন্দোলনে কিছু সমস্যা আত্মপ্রকাশ করল। যুক্তফ্রনট সরকার বর্গাদারদের জমিতে স্বত্ব দেবার আইন করেন নি, ফলে তাদের মাথার উপর ঝুলছিল উচ্ছেদের খড়্গ। বর্ষাকালে বর্গাদার খোরাকির ধান কর্জা পেত জোতদারের কাছে; এবার জোতদার কর্জা দেওয়া বন্ধ করল; ধান কর্জা পাবার বিকল্প প্রতিষ্ঠান ছিল না। মাছের ভেড়ি দখল হবার ফলে যারা ভেড়িতে নিযুক্ত ছিল সেইসব মজুর বেকার হল। ১৯৭০ সালের মার্চে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতির শাসন চাপিয়ে দিলেন এই রাজ্যে। সি. পি. আই. (এম) হল দমননীতির লক্ষ্য; কায়েমি স্বার্থের হিংস্র আক্রমণ শুরু হল। কৃষকসভার সম্পাদক জয়ন্ত ভট্টাচার্য কলকাতায় আশ্রয় নিলেন। জোতদারদের জীবনেও পরিবর্তন দেখা গেল। রণজিৎ নস্কর ট্র্যাক্টর কিনে মজুর নিয়োগ করে চাষ শুরু করলেন। অনেক ছোটো ভূস্বামী জমি বিক্রি করে দিলেন, জমি কিনল কৃষক। ভূস্বামী এবং সম্পন্ন কৃষক মহাজনিতে মূলধন নিয়োগ লাভজনক মনে করতেন না; তাঁদের স্থান পূরণ করলেন কলকাতার ব্যাবসাদার।[৫]

দমননীতির মুখে রাজ্যের সর্বত্র কৃষক আন্দোলন পিছু হটল; কোথাও কোনো প্রতিরোধ আন্দোলন দেখা গেল না। সি. পি. এম-এর কৃষকসভার সভ্যসংখ্যা ১৯৬৮-৬৯ সালে নয় লক্ষ থেকে কমে ১৯৭৫-৭৬-এ দাঁড়াল দুই লক্ষে; সি. পি. আই-এর কৃষকসভার সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র চব্বিশ হাজার। ১৯৭০ সালে সি. পি. আই-এর কৃষকসভা এককভাবে জমি দখলের আন্দোলন শুরু করেছিল, কিন্তু সে আন্দোলন গণসংগ্রামের পর্যায়ে ওঠে নি। সোনার-পুরের মাছের ভেড়ির ভূস্বামীরা আবার দখল করে নিল। শুধু রইল সাময়িক প্যারাডাইস লস্ট-এর তিক্ত স্মৃতি। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ইমারজেনসি ঘোষণা করলেন। কৃষক-আন্দোলন হল মুমূর্ষু। নকশালবাড়িতে আন্দোলন চূর্ণ হলেও জোরদাররা জমি পুনর্দখল করতে এই দুর্গম অঞ্চলে আর ফিরে আসে নি। জমি রইল কৃষকদের দখলে।

চার

মরা গাঙে জোয়ার এল ১৯৭৮ সালে। ১৯৭৭-এ বামফ্রনট ক্ষমতায় এল। আবার শুরু হল বেনাম জমি দখলের পুরনো আন্দোলন। আন্দোলনের ধরনও পুরনো—লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবকদের অভিযান। বাম-ফ্রনট সরকার একদিকে গরিব কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করলেন, অপরদিকে ভূমিসংস্কার আইন সংশোধন করে বর্গাদারের স্বার্থ সুরক্ষিত করার চেষ্টা হল। এই পর্বের উল্লেগযোগ্য ঘটনা "অপারেশন বর্গা", যার বিরুদ্ধে উচ্চবর্ণ থেকে আগত জমি-নির্ভর মধ্যবিত্ত "গেল, গেল" রব তুলেছিল। "অপারেশন বর্গা" কিন্তু

বর্গা-প্রথাকে বাতিল করে নি, জমির মালিকানা রইল আগের মতো জোতদারের হাতে; এই জোতদারদের একটি অংশ মধ্যবিত্ত। এর প্রধান উদ্দেশ্য উচ্ছেদ বন্ধ এবং বর্গাদারকে পুরুষানুক্রমে জমি চাষ করবার অধিকার দেয়। বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত হলে তাকে উচ্ছেদ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন; বর্গাদারের পক্ষে ফসলের বর্ধিত ভাগ (৭৫ শতাংশ) আদায় করা সম্ভব। রেকর্ডেড বর্গাদারের পক্ষে সরকারি ঋণ পাওয়ার পথ সুগম হল. এতকাল সরকারি ঋণ-ব্যবস্থার সে বাইরে ছিল; পুরোপুরি তাকে নির্ভর করতে হত জোতদরের কাছ থেকে সংগৃহীত "কর্জা বা বাড়ির" উপর। শতাব্দীর পুরনো এই ব্যবস্থা জোতদারের ক্ষমতার অদৃশ্য উৎস। ভূস্বামীদের একটি বড়ো অংশ ছোটো জমির মালিক (৫-৭ একর জমি যাদের দখলে); ভূমিরাজস্বমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে তাঁদের গায়ে হাত পড়বে না; তাঁদের ক্ষেত্রে আপসে বিরোধের মীমাংসা হবে। জোতদারের কাছে ধান জমা দেবার সময়, বর্গাদারকে ধানের রসিদ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হল; আদালতে এই রসিদ বর্গাদারের একমাত্র দলিল।

বর্গাদারদের সংখ্যা ঠিক কত, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকের মতে, সত্তরের দশকে এই সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। ১৯৮০ সাল নাগাদ রেকর্ডেড বর্গাদারের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ লক্ষ। অপারেশন বর্গার গতি যে মন্থর, তা বোঝা যায়। জোতদারদের বাধা উপেক্ষা করা বর্গাদারের পক্ষে খুব সহজ নয়। তদুপরি ছিল হাইকোর্টের ইনজাঙ্কশন। প্রায় এক লক্ষ একর জমিতে হাত দেবার উপায় ছিল না।

অপারেশন বর্গা রূপায়ণের কল্যাণে গ্রামে কি কোনো মৌলিক পরিবর্তন এসেছে? নৈরাশ্যবাদী পণ্ডিতদের মতে, এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ; জোতদারের ক্ষমতা অটুট; গ্রামে কোনো বিকল্প ঋণব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। সম্প্রতি একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠান কয়েকটি গ্রামে সমীক্ষা চালিয়েছে; কৃষকসভার কিছু কেন্দ্র এই গ্রামগুলির অন্তর্গত। এই সমীক্ষা থেকে যা জানা যায় সংক্ষেপে তা বলা হচ্ছে। সাধারণভাবে রেকর্ডেড বর্গাদার মনে করে তার সুবিধা হচ্ছে। কৃষকসমিতির শক্ত ঘাঁটিতে বর্গাদারদের বড়ো অংশ রেকর্ড করিয়েছে; অন্যত্র জোতদারের বাধার মুখে অপারেশন বর্গা মন্থর। রেকর্ডেড বর্গাদারও অনেক সময় ধানের ৭৫ শতাংশ ভাগ পায় না; আধি ভাগ এখনো চালু বহু গ্রামে। আগের মতো ভূস্বামী বর্গাদারকে উচ্ছেদ করতে সাহস পায় না। অবশ্য সে বর্গাদারকে ধান ঋণ দেওয়া প্রায় বন্ধ করেছে। বর্গাদারের ঋণসমস্যা তীব্র। সর্বত্র কৃষকসভা অপারেশন বর্গাকে আন্দোলন হিসাবে নিয়েছে; যেসব পঞ্চায়েত বামপন্থীদের দখলে তারাও বর্গাদারের পক্ষে। ভূস্বামীরা কোণঠাসা; তাঁরা বলেছেন, প্রাপ্য ভাগ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন; বর্গাদার লায়েক হয়েছে, তাই ফসলের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।[৬]

একদিকে অপারেশন বর্গা, অন্যদিকে পঞ্চায়েতে বামপন্থীদের প্রাধান্যের বিস্তার কৃষকসভাকে শক্তিশালী করলেও, ১৯৬৮-৬৯ পর্বে জঙ্গি আন্দোলন পশ্চাৎপটে চলে গেল। ভূস্বামী শ্রেণীও পিছু হটেছে বলে মনে হয়। সি. পি এম-এর কৃষকসভার সভ্য-সংখ্যা বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে: ১৯৭৬-৭৭-র ১২ লক্ষ থেকে ১৯৭৭-৭৮ সালে ২৮ লক্ষ; সভ্যদের ৪৫ শতাংশ সংগৃহীত হয়েছে দলের দুর্গ বর্ধমান, ২৪-পরগনা এবং মেদিনীপুর থেকে। সি. পি. আই-এর কৃষকসভার সভ্যসংখ্যা ১৯৭৯-৮০ সালে ছিল ৮৮ হাজার, যার ৫০ শতাংশ এসেছিল মেদিনীপুর জেলা থেকে। আজ আশির দশকে কৃষকসভার নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত এবং সম্পন্ন কৃষকদের হাতে; সি. পি. এম-এর কৃষকসভার প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯৭৯) উপস্থিত ৭৫৭ জন প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন ৩৬৫ জন সধ্যবিত্ত, ২৪ জন জোতদার, ১৭ জন ধনী কৃষক, ১৪৫ জন মাঝারি কৃষক, ১৩৩ জন গরিব কৃষক এবং মাত্র

৪৫ জন খেতমজুর।[৭] মধ্যবিত্তদের মধ্যে কতজন বুদ্ধিজীবী ছিলেন তা জানা যায় নি। তবে বুদ্ধিজীবী কৃষক আন্দোলনের দিকে ঝুঁকছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

পাঁচ

কৃষক-আন্দোলনে ভাঁটার টান চলে অনেক বছর ধরে; হঠাৎ জোয়ার আসে। কৃষকের বৈপ্লবিক ভূমিকা নির্ভর করে ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা এবং বাস্তব অবস্থার উপর। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান অস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল। পশ্চাৎপদ সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কৃষকের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ মন্থর; তাঁদের মধ্যে উন্নত চিন্তার বিকাশে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য বুদ্ধিজীবীর সীমাবদ্ধতা আছে। কৃষকদের আন্দোলন অর্থনীতিবাদের সীমানা ছাড়িয়ে গেলে বুদ্ধিজীবী দোটানায় পড়েন।

ব্যারিংটন মুরের মতে, ভারতীয় কৃষক নিরীহ ("ডোসাইল"); চীন এবং রাশিয়ার তুলনায় বৈপ্লবিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা নগণ্য। ক্যাথলিন গফ দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিক পর্বে অসংখ্য ছোটো-বড়ো সশস্ত্র বিদ্রোহে ভারতীয় কৃষক যোগ দিয়েছে; এর মূলে ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের জ্বালা। স্বাধীনতার পরেও কৃষক-আন্দোলনের ধারা অব্যাহত ছিল, বিশেষত দক্ষিণ ভারতে; মাওবাদী গোষ্ঠীর ভূমিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী গফ-এর লেখা পড়ে মনে হয়, ব্রিটিশ পর্বের সশস্ত্র কৃষক-বিদ্রোহের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা বর্তমানে ক্ষীণ।[৮] কিন্তু কেন? বর্তমান লেখকের ধারণা, স্বাধীনতার পরে কৃষিসম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেছে। যে ছিল সম্পন্ন কৃষক, সে এখন ধনতান্ত্রিক কৃষির দিকে ঝুঁকছে; পুরনো ভূস্বামী, এমন-কি ব্যবসায়ী শ্রেণী মূলধন বিনিয়োগ করছে ধনতান্ত্রিক কৃষিতে। সমবায় সমিতি দের দখলে। ধনী কৃষক আর গরিব কৃষক এখন দুই বিরোধী শিবিরে। এই অবস্থায় খেতমজুরের সংগঠন এবং আন্দোলন আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ হবে। দক্ষিণ ভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে খেতমজুরের আন্দোলন দুর্বল এবং অসংগঠিত। সামাজিক রূপান্তর ঘটাতে বর্গাদার আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা বিলীয়মান। বর্গাপ্রথাটাই পশ্চাৎপদ কৃষির অবশেষ এবং কৃষির আধুনিকীকরণের পথে বাধা। রাশিয়ার ওত্রাবতকি ("otrabotki") সম্বন্ধে লেনিনের লেখা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

সাবঅলটার্ন মতবাদের প্রধান প্রবক্তা রণজিৎ গুহ কৃষকবিদ্রোহের তত্ত্ব নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। লক্ষ করবার বিষয়, সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং বীরসা মুণ্ডার "উলগুলনে" তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয়।[৯] দুটি বিদ্রোহই আদিবাসী কৃষকদের বিদ্রোহ। আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে অন্তর্নিহিত বৈপ্লবিক সম্ভাবনা তেভাগা এবং তেলেঙ্গানা আন্দোলনেও প্রতিফলিত; নকশালবাড়ি আন্দোলনেও এঁদের আমরা দেখেছি। আদিবাসীদের মধ্যে প্রতিভাত জাতিগত ঐক্য (ethnic unity), শ্রেণীগত স্বার্থ দিয়ে যে বিষয়টি ঠিক বোধগম্য হয় না। এখন প্রশ্ন হল, বর্গা হিন্দু, মুসলমান, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য কৃষকদের ভূমিকা আলোচনা না করে কৃষকবিদ্রোহের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা কি সম্ভব? মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং হাওড়ার কৃষক-আন্দোলন বুঝতে হলে মাহিষ্যদের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। তেভাগা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলমান কৃষকদের পরিবর্তনশীল ভূমিকা বর্তমান লেখকের মনে পড়ে। রাজবংশীদের জীবন আর ধ্যানধারণা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কি?

বাস্তবকে অতিরঞ্জিত করে লাভ নেই। কৃষকদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং বৈপ্লবিক ভূমিকা প্রসঙ্গে মার্কসের সুবিখ্যাত মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জোতের মালিক কৃষক যেন "আলুর বস্তা"।

বহির্জগতের সঙ্গে এঁদের কোনো সংযোগ নেই; এঁদের সমাজজীবন স্থিতিশীল; প্রতিটি কৃষক পরিবার স্বয়ং-সম্পূর্ণ। এই কৃষক রক্ষণশীল, সে শুধু দেখে 'নিজের অতীত, ভবিষ্যৎ নয়।' কিন্তু কৃষকের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। কৃষিতে বুরজোয়া মূলধনের অনুপ্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের জীবনে দেখা যায় জমি বন্ধক দেয়া, ঋণের বোঝা এবং জমি হারানোর প্রক্রিয়া। কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ আর বুরজোয়া স্বার্থের মধ্যে গড়ে ওঠে বিরোধ; তাই সে তার মিত্র এবং নেতা খুঁজে বেড়ায় শহরের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে।[১০] রুশ বিপ্লবের আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতে কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণী তার শেষ অস্ত্র—সাধারণ ধর্মঘট—ব্যবহার করেন নি কোনোদিন। পশ্চিমবঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন কিন্তু নিঃসন্দেহে শক্তিশালী।

টীকা

১. তেভাগা ও টংক আন্দোলনের জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের বই Peasant Movements In India, 1982। তেভাগা আন্দোলনে যোগদানের সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছিল। আরো দ্র. বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, ১৯৭৩; মেসবাহ কামাল, দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯৮৩।

২. এই দুষ্প্রাপ্য দলিল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে "বিচিত্রা" পত্রিকায়, জুলাই ১৯৮৬। কাকদ্বীপ সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ আলোচনা, মৈত্রেয় ঘটক, কাকদ্বীপ ১৯৪৬-৫০, বর্তিকা, এপ্রিল ১৯৮৬।

৩. Barrington Moore, Social Origin of Dictatorship and Democracy, 1967.

৪. বর্তমান লেখকের পূর্বোক্ত বই।

৫. স্বস্তি মিত্র, Peasant Movement in West Bengal, 1977.

৬. Cressida, Tenancy Reform ; The Power Structure and the Role of the Administration,—An Evaluation of Operation Barga, 1986.

৭. সম্পাদকের রিপোর্ট, প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন, বাঁকুড়া, ১৯৭১।

৮. Cathleen Gough, Indian Peasant Uprisings, Economic and Political Weekly, August 1974.

৯. Ranajit Guha, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, 1983.

১০. K. Marx, Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, Marx and Engels, Selected Works, Vol. 1, 1977.

গ্রাহকদের প্রতি

যাঁদের চাঁদার মেয়াদ এপ্রিল ১৯৮৭ (চৈত্র ১৩৯৩) মাসে শেষ হয়েছে তাঁরা অনুগ্রহ করে যথাসত্বর নতুন বছরের চাঁদা পাঠালে বাধিত হব। কলকাতার বাইরের চেক গ্রহণ করা সম্ভব নয়। নতুন বছরের চাঁদার হার বার্ষিক ৪৫ টাকা, যান্মাসিক ২৪ টাকা। টাকা পাঠাবার সময় গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করলে সুবিধা হয়।

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কুড়ি

We are the bird's eggs, flowers, butterflies...
We are leaves of ivy and sprigs of wallflower.
...lilies and roses and peach, we are air.
We are flame...We are Woman and
Nature. And he says he cannot hear us speak.
But we speak.

Woman and Nature—Susan Griffin.

কে আপনি ?
মানুষ।
কী মানুষ ?
পুরুষমানুষ।
জাতি ?
মানুষ।
ধর্ম ?
মানুষত্ব।
দেশ ?
পৃথিবী।

স্বাধীন মূর্ছিতা রত্নময়ীর চেতনা ফেরাতে গেলে সে উঠে বসে এবং আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে প্রশ্নগুলি করে এবং ওই উত্তরগুলি দিই। মনে হয়, দুজনেই এভাবে একপ্রকার খেলা করছিলাম। স্বাধীন মুখ টিপে হাসছিল। রত্নময়ীর শেষ বাক্যটি ছিল : পৃথিবী একটি আবর্তনশীল গ্রহ এবং মানুষ দ্বিপদ প্রাণী-মাত্র। সম্ভবত উহার মুখ দিয়া 'জিনটিই' বাক্যগুলি উচ্চারণ করিতেছিল। স্পষ্ট মনে আছে, ধর্মের প্রশ্নে আমি 'মনুষ্যত্ব' বলি নি, 'মানুষত্ব' বলেছিলাম। এ দুয়ের তফাত আছে।

গিয়াসপণ্ডিত হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা করতেন। তিনি বাবু গোবিন্দরাম সিংহকে রত্নময়ীর চিকিৎসার জন্য অনুরোধ জানান। বলেন, এই ব্যাধির নাম হিসটিরিয়া। হোমিওপ্যাথিতে এর উৎকৃষ্ট ওষুধ হল

ইগনেশিয়া। শুনেছি, গিয়াসপণ্ডিত কয়েক ডোজ ওষুধও দিয়েছিলেন। পরে গোবিন্দরাম রত্নময়ীকে নিয়ে কৃষ্ণপুর রাজবাড়িতে ফিরে গেলে একদিন গিয়াসপণ্ডিত আশ্রমের একটি বৈঠকে কথাপ্রসঙ্গে বলেন, পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা বহু দুঃখক্লেশ-সন্তাপ মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হয় এবং পরিণামে সেইগুলিন মানসিক বৈকল্য সৃষ্টি করে। সেই বৈঠকেই দেবনারায়ণদা সহসা একটি অদ্ভুত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আমি বাকরহিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসি। প্রস্তাবটি হল, গিয়াস-কন্যা রেহানার সঙ্গে আমার বিবাহ!

ব্রহ্মপুরে ক মাস পরে দেবনারায়ণদা একটি হাট বসান। ক্রমশ কিছু দোকানপাটও বসতে থাকে। সামান্য সেলামি আর বার্ষিক খাজনায় দেবনারায়ণদা মাটির বন্দোবস্ত করতে ব্যগ্র ছিলেন। বুঝতে পারতাম, তাঁর ধর্মপ্রচারণাকে উত্তরোত্তর আর্থিক চাপ দাবিয়ে রাখছে। তাঁর পরিকল্পিত স্বর্গরাষ্ট্রে এভাবেই নারকীয় সংক্রমণ ঘটছিল। ব্রাহ্ম বালক আর বালিকাদের দুটি পৃথক বিদ্যালয় ছিল। সেখানে অ-ব্রাহ্ম ছাত্র-ছাত্রীদের নেওয়া হতে থাকে। যে বাঁজা ডাঙ্গায় শিবনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা করেছিলেন, এক বছরের মধ্যে সেটি বসতিতে পরিণত হয়। উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দাপট বাড়তে থাকে। সেখানে দেবদেবীর পূজাও শুরু হয়। কিন্তু আশ্রম এলাকাকে দেবনারায়ণদা কঠোর হাতে রক্ষা করতেন। তাহলেও ক্রমশ তাঁর প্রিয় আবাদ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। দুর্ধর্ষ বাঁকা সর্দার বিজয়পল্লীতে চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন চালু করে। সঙের দলের মজা দেখতে খুব ভিড় হয়েছিল। ক্রুদ্ধ দেবনারায়ণ পাইকদল পাঠান। দাঙ্গার উপক্রম হয়। ব্রহ্মপুরের ভদ্রলোকেরা গিয়ে রফা করেন। তারপর ব্রহ্মপুরে একটি পুলিশ-ফাঁড়ি বসে।

আদিবাসীরাও নিজেদের ধর্ম পালন করত। মুরগি বলি দিত। মাঝে-মাঝে তাদের সঙ্গে বাঁকার দলের দাঙ্গা বাধত। তীরধনুকটাঙ্গি হাতে সাঁওতালরা দুর্ভেদ্য পাঁচিলের মতো দাঁড়াত। খুনখারাপি হত। এভাবে আবাদে অশান্তি বাড়ছিল। কিন্তু দেবনারায়ণ তবু তাঁর স্বর্গরাষ্ট্রস্থাপনে বিশ্বাস হারান নি। তাঁত-কারখানা, তালাই আর মাদুর তৈরি, সমবায়কৃষিঋণ-দানসমিতি—এসব কাজে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন। স্ট্যানলির নুরপুর রেশমকুঠি কিনেছিলেন এক হিন্দু জমিদার। চালাতে পারেন নি। সেখান থেকে দলে-দলে হিন্দু তাঁতি আর মুসলিম জোলারা এসে ব্রহ্মপুরে ভিড় করে। প্রায় একশোটি তাঁতে সারাক্ষণ মাকুর খটাখট শব্দ শোনা যেত। সুতোকাটুনি মেয়েরা খোলা মাঠে বা গাছতলায় বসে সুর ধরে গান গাইতে-গাইতে চরকায় সুতো কাটত।

একদিন সেই সুতোকাটুনিদের মধ্যে একটি মেয়েকে দেখে চমকে উঠি। তাকে খুব চেনা মনে হচ্ছিল। তাঁত-কারখানার জন্য দেবনারায়ণ একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর নাম বসন্ত প্রামাণিক। কালো, লম্বাটে এবং মোটা হাড়ের কাঠামো এই লোকটির মেজাজ ছিল রুক্ষ। আশ্রম এলাকায় তিনিই শুধু প্যানট কোট পরে থাকতেন। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না। দেবনারায়ণদার মতে, বসন্ত-বাবু অভিজ্ঞ এবং দক্ষ লোক। তবে তিনি আমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে চলতেন। তখন আমি আশ্রম-লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। মাসে আর হাতখরচ নয়, রীতিমতো পনেরো টাকা বেতন পাই। সেই কয়েকটি বৎসর আমি গ্রন্থকীটে পরিণত হয়েছিলাম। তো সেকথা থাক। একদিন দুপুরে গাছতলায় ওই সুতো-কাটুনিকে দেখার পর বসন্তবাবুকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। তখন বসন্তবাবু আমাকে প্রচণ্ড অবাক করে বলেন, সে কী! করুণাকে আপনি চেনেন না? কে না চেনে ওকে? ও আপনার স্বজাতির মেয়ে। দেবনারায়ণবাবু ওকে হিন্দু ধর্মে—অবশ্য ব্রাহ্মধর্মেই বলা উচিত, দীক্ষিত করেছেন। তবে—কাউকে বলবেন না যেন, ওর স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। বসন্তবাবুর চেহারাতেও রুক্ষতা ছিল। হাসলে

মনে হত, কামড়াতে আসছেন। সেই হাসি হেসে ফের বললেন, সুতোকাটুনিরা গোপনে আমাকে বলেছে, করুণা ডাকিনীবিদ্যা জানে। নিশুতি রাত্তিরে নাকি গাছে চড়ে সে। সেই গাছ আকাশে উড়িয়ে কামরূপ-কামাখ্যায় যায়। ভোরের আগে ফিরে আসে। অল সর্টস অফ ননসেনস টকিংস! আই ডোনট বিলিভ শফিবাবু! আসলে মেয়েটা চরিত্র-হীনা। আপনি দেখবেন, শি উইল ডিমরালাইজ দা হোল সেট্‌লমেনট। আমার মশায় কর্তার ইচ্ছায় কম্ম। দেববাবুর সুনজরে না থাকলে ওকে অ্যাদ্দিন তাড়িয়ে দিতাম।

হুঁ, চিনলাম। এ নিশ্চয় মৌলাহাটের সেই আবদুলের বউ ইক্‌রা। কিন্তু মেয়েটি ধূর্ত এবং সাতিশয় কপট। বিকেলে সুতোকাটুনিরা সুতো জমা দিতে কারখানার সামনে ভিড় করে। সে সুতো জমা দিয়ে কাটুনিপাড়ার দিকে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিল। বেলা পড়ে এসেছে। খালের এধারে উঁচু জমির ওপর ছিটেবেড়ার ছোটো-ছোটো ঘর। আগাছার ঝোপের ভিতর দিয়ে একফালি সংকীর্ণ পায়েচলা পথ। আমার পায়ের শব্দে সে ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে বললাম, ইক্‌রা, আমাকে চিনতে পারছ?

সে ভুরু কুঁচকে সেই বেড়ালের মতো পিঙ্গল দুটি চোখে আগুনের ছটা এনে বলল, কে ইক্‌রা? আমার নাম করুণা।

ইক্‌রা! আমি মৌলাহাটের শফি। আমি তোমাকে যেমন চিনি, তুমিও আমাকে চেন!

বাজে কথা বলবেন না, বাবু! এক্ষুনি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।

ক্রোধ সংবরণ করে চলে এলাম। বুঝলাম এই নারী ভয়ংকরী। ভাবলাম, দেবনারায়ণদাকে এর সম্পর্কে সতর্ক করা দরকার। কিন্তু ওই কালে বহির্জগৎ সম্পর্কে এক প্রগাঢ় নির্লিপ্ততা আমাকে পেয়ে বসেছিল। আরও কিছুদিন পরে বসন্তবাবু একরাত্রে আমার ঘরে এলেন। একথা-সেকথার পর হঠাৎ দেঁতো হেসে চাপা গলায় বললেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। কিছু মনে করবেন না যেন।

বললাম, না। আপনি বলুন!

আপনি নাকি এক পিরসাহেবের ছেলে। সত্য কি?

হ্যাঁ।

মৌলাহাটের পিরসাহেবই কি আপনার বাবা?

চোখে চোখে রেখে মাথা দোলালাম। উনি চুপ করে আছেন দেখে তখন বললাম, কেন?

শুনলাম,—আই মীন, কাটুনিদের মধ্যে আমার লোক আছে, অবশ্যই স্ত্রীলোক, আপনার বাবা নুরপুরে ছিলেন কিছুকাল।

আস্তে বললাম, শুনেছিলাম।

শোনেন নি করুণা যখন মুসলমান ছিল, তখন তাকে আপনার বাবা বিয়ে করেছিলেন, পরে ডিভোরস করেন?

দিস ইজ অ্যাবসার্ড!

বসন্তবাবু দেঁতো হাসি হেসে বললেন, করুণা তাই বলেছে। সে আপনার বাবার নামে অকথ্য-কুকথ্য নিন্দামন্দ করেছে। কাটুনিরা অনেকেই জেনে গেছে সে-কথা। বোঝেন তো ওসব ছোটোলোক মেয়েদের ব্যাপার-স্যাপার। ওদের পেটে কথা থাকে না। আমি দেববাবুকে বলতে সাহস পাই না। আপনি বলুন ওঁকে। শিগগির মেয়েটাকে এখান থেকে তাড়ানো দরকার।

কেন?

বসন্তবাবু ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ গোঁফে তা দিলেন। তারপর চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন। আমার সন্দেহ হল, লোকটি ইকরা ওরফে করুণার প্রেমভিখারি। কিন্তু আমার পিতা ইকরাকে বিয়ে করেছিলেন, ভাবতে অবাক লাগল। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। পিতার মুখে অসংখ্যবার শাস্ত্রীয় বাচন শুনেছি, যা

তিনি জীবনযাপনেও সতর্ক এবং দৃঢ় ভাবে পালন করতেন, 'হে মুসলমান! পাক কেতাবে আল্লাহ্ বলেছেন, যদি মনে কর একাধিক আওরতের প্রতি সমান আচরণ ও সুবিচার করতে পারবে, তবেই দুই, তিন এবং চার পর্যন্ত নিকাহ্ করতে পার।' তাছাড়া তিনি কোথাও কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করছে শুনলে ক্ষুব্ধ হতেন। সতর্ক করে দিয়ে শাস্ত্র আবৃত্তি করতেন। তাঁর পক্ষে ইকরাকে বিয়ে করা অসম্ভব।

গিয়াসপণ্ডিতের কন্যাকে বিয়ে করতে চাই নি বলে উনি আমার সঙ্গে আগের মতো কথাবার্তা বলতেন না। নেহাত প্রয়োজনে দু-চারটি কথা বলতেন মাত্র। সেবার আশ্রমে বাঙলা নববর্ষ উৎসব হল। হৃদয়নাথ শাস্ত্রী বেদপাঠ করলেন। দেবনারায়ণদা বাইবেলের "সাম্‌স্" অংশ পড়লেন। গিয়াসপণ্ডিতের কন্যা রেহানা কোরান আবৃত্তি করল। (হায়! এই বিদুষী তরুণীর মধ্যে একটি খাঁচার পাখিই দেখিয়াছিলাম। আমি যে প্রকৃতিচর—বনের পাখিই আমার প্রিয়।) ত্রিপিটক পাঠ করলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আচার্য ভবতোষ গাঙ্গুলি। শেষে দেখি, 'হাজারিলাল'—হরিবাবু তুলসীদাসের কয়েকটি দোঁহা সুর ধরে আবৃত্তি করলেন।

আগের দিন চৈত্রসংক্রান্তিতে বিজয়পল্লীতে খুব জমকালো গাজন হয়েছিল। সভার ব্রাহ্ম বক্তারা প্রত্যেকে একথা উল্লেখ করে কড়া সমালোচনা করলেন। বিশেষ করে সঙের গানে ও নাটকে নাকি 'ওই ইতরজনেরা নামী সজ্জনদের সম্পর্কে কুৎসা ও খেউড় কীর্তন করেছে।' তারপর গিয়াসপণ্ডিত বক্তৃতা দিতে উঠলেন। বাঙলা নববর্ষ এবং হিজরিসনের সম্পর্কের ইতিহাস বর্ণনার পর হঠাৎ জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে শুরু করলেন। একটু পরে চমকে উঠলাম শুনে: 'মৌলাহাটের মহাসম্মানিত একেশ্বরবাদী সাধকপুরুষ হজরত সৈয়দ বদিউজ্জামান, যাঁর সুবিদিত ওহাবি ভাবধারার মধ্যে আমাদিগের ব্রাহ্মধর্মের বহু সাদৃশ্য বিদ্যমান—যেহেতু আমরাও ধর্মক্ষেত্রে নিরাড়ম্বর সারল্য এবং তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—ত্যাগের দ্বারা ভোগব্রতে ব্রতী, হজরত বদিউজ্জামানও অনুরূপ ব্রতের প্রচারক এবং বিলাসিতাবর্জন করে পরমব্রহ্মের সম্মুখীন হওনের নিমিত্ত আহ্বান করেন, তিনিও তৌহিদ বা একত্ববাদের প্রবক্তা, সেই হেতু তিনিও আমাদিগের নমস্য—অথচ গতকল্য বিজয়পল্লীতে দুর্বৃত্ত ব্যক্তিরা তাঁর নামেও সঙের ব্যঙ্গরজনক গীতাদি নাট্যাদি অভিনয় করত কুৎসা রটিয়েছে। এমন কী, এক দুর্জন হারামজাদ ব্যক্তি শনের দাড়ি এঁটে টুপি পরে ওই মুসলমান আচার্যের নকল করেছে। ধিক! শত ধিক! সুধন্য নামে আরেক দুর্বৃত্ত যুবক স্ত্রীলোক সেজে দাড়িটুপিজোববাধারী শয়তানের সঙ্গে—ছি! ছি! মুখে উচ্চারণ করতে ঘৃণা বোধ হয়।'

সভায় ধিক্কারধ্বনি শোনা গেল, অবশ্য তা মৃদু এবং ম্রিয়মাণ। আমি বাঁধের পথে বিভ্রান্তভাবে হেঁটে গেলাম। বিজয়পল্লীর কাছে গিয়ে একটু দাঁড়ালাম। তারপর উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে-হাঁটতে আবাদ এলাকা পেরিয়ে শঙ্খিনীর ধারে নতুন বাঁধে একটি ঝুঁকে-পড়া গাছের ছায়ায় শুকনো বালির চড়ায় বসে পড়লাম। একটি সাঁওতাল যুবক তীর-ধনুক হাতে ওপারের জঙ্গল থেকে নদীতে নামল। হাঁটুজল পেরিয়ে এসে সে আমাকে দেখতে পেল এবং নির্লিপ্ত দৃষ্টে তাকিয়ে নিয়ে চলে গেল। নিসর্গের অন্তর্ভুক্ত একটি সত্তার প্রকাশ যেন, একটি ক্ষুৎকাতর কাঠবেড়ালির সঞ্চরণ যেভাবে দেখি। উহাদিগের বিদ্রোহের বৃত্তান্ত পড়িয়াছি। উহারা বস্তুত নিসর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল। 'দিকু'গণ উহাদিগকে আবার নিসর্গের অঙ্গীভূত করিয়াছে। ওই কৃষ্ণকায় যুবকটিকে দেখিয়া হঠাৎ আবার Revelation ঘটিল। নিসর্গ কি সত্যই প্রশান্তিময়? নাকি আমার 'দিকু'-অবচেতনাঘটিত বিভ্রম? এখানে ধারাবাহিক সংগ্রাম। টিঁকিয়া থাকার জন্য মরণপণ যুদ্ধ। প্রকৃতির যে নিভৃত বৃত্তটি নিসর্গরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, উহার মধ্যেও সংগ্রামস্রোত বহিতেছে। বৃক্ষলতাও

এখানে সংগ্রামরত। মাটি ও জলও সংঘর্ষে লিপ্ত। জড় ও অজড়, স্থাবর ও জঙ্গম মুখোমুখি লড়িতেছে। কোথাও জাড্য নাই। হেনরি ডেভিড থরো কি ইহাকেই 'strange feelings' বলিয়াছেন? বড়ো বিলম্বে উপলব্ধি করিলাম বাক্যটির প্রকৃত মর্ম্মার্থ কী। 'Disobedience'-তত্ত্বের উৎস এইখানেই নিহিত। আত্মস্থ আত্মসমর্পণ নহে, অবাধ্য হও।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। ছায়া ঈষৎ প্রলম্বিত হয়ে স্রোত ছুঁই-ছুঁই করছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে। নদীর স্বচ্ছ জল পান করে যখন ফিরে চলেছি, তখন আমার ভিতরকার ঘাতক-সত্তা দীর্ঘ নিদ্রার পর আড়ামোড়া দিচ্ছে। শুকনো খাল পেরিয়ে সুনয়নী দেবীর কুটিরের সামনে পৌঁছে স্বাধীনকে দেখতে পেলাম। সে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু শুনছিল বা দেখছিল। সুতোকাটুনিদের কারখানার দিক থেকে চ্যাঁচামেচি কানে এল। ওরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে। নতুন ঘটনা নয়। স্বাধীন আমাকে দেখে বলল, এদিকে কোথায় গিয়েছিলে? একটু থেমে ফের বলল, তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?

কিছু না। বলে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর ডানদিকে তাকাতেই একটি বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল। দুটি স্ত্রীলোক মুখোমুখি যুযুধান মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা দুজনকে নিরস্ত করার জন্য চ্যাঁচামেচি করছে। একজনকে চিনতে পারলাম। ইকরা ওরফে করুণা। অন্যজন প্রৌঢ়া। হাড়গিলে চেহারা। সে বেশি মারমুখী। নিছক কৌতূহলে কিছুটা কাছাকাছি গেলাম। তাঁতশালার পুরুষেরা বারান্দা থেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে মজা উপভোগ করছে। সম্ভবত বসন্তবাবু ভাতঘুম দিচ্ছেন স্বগৃহে। নতুবা এতখানি বাড়াবাড়ি ঘটত না। প্রৌঢ়া যে মুসলমান, তার চেহারা আর কথাবার্তায় স্পষ্ট। সে চেরা গলায় বলছে, বেউশ্যা ডাহিন মাগী! আমার নন্‌দাই (ননদের স্বামী) বুজুর্গ পির—তেনার ঘরে একশো জিন পোষা আছে, ছাখ্ না তোর কী খোয়ার করে! খপর যেতে দেরি! হা আল্লা, এখানে কি মোসলমান নাই একজনাও, এই হারামজাদিকে জবাই করে গাজি হয়?

বুক ধড়াস করে উঠল। আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। ইকরার পিঙ্গল চোখ থেকে আগুন জল হয়ে ঝরছে। মনে হল, ইতিমধ্যে যথেষ্ট গাল দিয়ে তার পুঁজি শেষ। অথবা ক্রোধে সে বাকরহিত।

প্রৌঢ়ার দিকে তাকালাম। অথবা স্মৃতির দিকে। চেনা মনে হয় কি? প্রতিপক্ষ পরাহত বুঝে সে ফের হুংকার দিল। থাম্, থাম্! পিরসাহেব যদি বা তোকে মাফ করেন, আমি করব না। আজই ভগবানগোলায় খপর ভেজছি মিরের ব্যাটার কাছে। তার নামে বাঘেগোরুতে একঘাটে পানি খায়। এখানেই তার লোক আছে ঘাপটি পেতে। থাম, ডেকে আনছি বাঁকা বাগদিকে।

চিনলাম। অজিফা-মামীই বটে! মামা তাঁকে তালাক দেওয়ার পরদিন ভগবানগোলায় গিয়েছিলাম। অজিফা-মামী তাহলে পেটের দায়ে এখানে এসে সুতোকাটুনি হয়েছেন!

দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে চলে এলাম। নিজের ঘরে ঢুকে আচ্ছন্ন অবস্থায় বসে রইলাম। কী বিচিত্র এই জীবন! অভিজাতবংশীয় দুটি লোক—একজন শ্যালক, অপরজন তাঁর ভগ্নিপতি—তাঁদের পরিত্যক্তা দুটি স্ত্রীলোক অপ্রাসঙ্গিক কলহে লিপ্তা! হতভাগিনীদের কে বোঝাবে তাঁরা বস্তুত কী? একজন দস্যুসর্দার, অপরজন ধর্মগুরু। কিন্তু দুজনেই পুরুষ।

সেইরাত্রে অন্ধকার ঘরে স্বপ্নের মধ্যে আমি এইপ্রকার কথোপকথনে লিপ্ত হইয়াছিলাম। আমার সম্মুখে দুইটি স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান ছিল।

তোমরা কে?

আমরা পাখি, ফুল, প্রজাপতি।

কে তোমরা?

আমরা বায়ু, অগ্নিশিখা।

তোমরা কি মনুষ্য নহ ?
আমরা স্ত্রীলোক, প্রকৃতি।
তোমরা কি মনুষ্যের ভাষা বুঝিতে পার না ?
উহারা শুনিতে পায় না।
তোমরা কী বলিতেছ ?
আমরা কথা বলিতেছি।...

'Heaven is nearer through football than through the Gita.

সকালে 'হাজারিলালে'র খোঁজে গেলাম। আমার মধ্যে স্বাধীন-কথিত 'দুর্দান্ত বাঘ' গরগর করছিল। গত কয়েকটি বছর আমি নিজের ভিতর যেন সমাহিত ছিলাম। শুধু গ্রন্থপাঠ আর উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ। জীবন এবং জগৎকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা। হরিবাবু আমার হাবভাব আঁচ করেই আর বিশেষ যোগাযোগ করতেন না। কিন্তু মানুষের মনের রহস্য বোঝা কঠিন। কোথায় আঘাত লাগে, কোথায় ঝনঝন শব্দ ওঠে! পিতার নামে কুৎসার আঘাতই কি আমাকে বিলম্বিত 'হাইবারনেশন' থেকে জাগিয়ে দিয়েছিল ? জানি না। বুঝি না। শুধু এইটুকু বুঝি, প্রচণ্ডভাবে বেজে উঠেছিল মনের অন্য একটি তন্ত্রী। গ্রাম্য প্রবাদে আছে: 'লঙ্কাধামে রাবণ মলো / বেউলা কেঁদে রাঁড়ি হল!' হাসির কথা নয়। এমনই হয়।

হরিবাবু তাঁর কুটিরের সামনে গাবগাছের তলায় বাঁশের মাচানে বসে পাথরের থালায় ছাতু খাচ্ছিলেন। আমাকে আসতে দেখে তাকিয়ে রইলেন। কাছে গিয়ে অনুচ্চস্বরে বললাম, বন্দেমাতরম্!

হরিবাবু হাসলেন। কী ব্যাপার ? হঠাৎ—

মাচানে বসে বললাম, মনে বাতব্যাধি ধরে গেছে। একটা কিছু করতে চাই। ছোটাছুটি, চিৎকার, হত্যা—এরকম কিছু।

হরিবাবু চুপচাপ ছাতু শেষ করলেন। ঘটি থেকে গলায় জল ঢাললেন। তারপর নীচের গভীর নয়ান-জুলিতে ঘোলা জলে পাত্রটি সযত্নে ধুয়ে আনলেন। সেটি কুটিরের ভেতর রেখে মাচানে এসে বসলেন। গামছায় গোঁফ আর খোঁচাখোঁচা দাড়ি মুছে বললেন, নতুন কোনো বই পড়লে বুঝি ?

সব বই-ই পুরনো, হরিদা! নতুন—

চুপ। বাতাসের কান আছে। হাজারিদা বলো!

হাজারিদা, আমি এখানে আর থাকব না। আমার চুপচাপ সঙ সেজে বসে থাকতে আর ইচ্ছে করছে না।

ফুটবল খেলো!

নড়ে বসলাম। বললাম, পরিহাস করছেন ?

হরিবাবুর মুখে কৌতুকের চিহ্ন ছিল না। গম্ভীর-মুখে বললেন, তুমি নিশ্চয় স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনেছ ?

শুনেছি। শাস্ত্রীমশাইয়ের ছেলে অজয়ের কাছে তাঁর চিকাগো বক্তৃতা নামে একটি বইও পড়েছি। আমাদের লাইব্রেরিতে ওঁর কোনো বই দেখি নি।

হরিবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, ব্রাহ্মরা ওঁকে সম্ভবত পছন্দ করে না। অথচ সারা ভারতবর্ষ স্বামীজির নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। তোমাকে যে ফুট-বল খেলতে বললাম, বাক্যটি তাঁরই। 'Heaven is nearer through football than through Gita'.

কেন একথা বলেছেন উনি ?

হরিবাবু চারদিক দেখে নিয়ে বললেন, আমরা থেমে নেই। তুমি তো নিয়মিত সম্বাদপত্র পড়।

নিয়মিত নয়, মাঝে-মাঝে পড়ি।

বন্দেমাতরম্ সমিতির সদস্যরা নতুন একটি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে। গত ২৪ মার্চ জনৈক ব্যারিস্টর প্রমথনাথ মিত্র—তিনি পি মিত্র নামে খ্যাত, তিনি, সতীশচন্দ্র বসু, পুলিনবিহারী দাশ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি কলিকাতায় 'অনুশীলন সমিতি' নামে একটি দল গড়েছেন। প্রকাশ্যে এই গুপ্ত বিপ্লবী দলের কাজকর্ম হল, তরুণ-তরুণীদিগের খেলাধুলা, ব্যায়ামাগারে শরীরচর্চা, লাঠি-ছোরাখেলা ইত্যাদি ইত্যাদি। কালীমোহনদা ব্রহ্মপুরে এসে স্বামীজি সংঘ নামে একটি ক্লাব স্থাপন করে গেছেন। তুমি যেন আশ্রমে এসব কথা ঘুণাক্ষরে আলোচনা কোরো না।

আমি কী করব, বলুন ?

শফি, বললাম তো ফুটবল খেলো!

আপনি খেলেন কি ?

আমার কথায় ক্ষোভ ছিল। হরিবাবু মুচকি হেসে বললেন, স্বামী বিবেকানন্দ গীতার একটি উক্তি শ্লোগানের মতো সারা ভারতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন: 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। ফুটবলও একপ্রকার বলের সঞ্চার করে দেহে। তবে হাজারিলালকে ফুটবল খেলতে দেখলে টিকটিকি মাথা নেড়ে দেবে। ব্যস! কাজেই হাজারিলাল—যার দেশ কি না বিহার মুল্লুক এবং যেখানে লাঠিখেলা না জানলে মরদ বলে না, সে লাঠিখেলা শেখাবে। শেখাচ্ছে।

লাঠি! ধুস! তলোয়ারখেলা হলেও মানে হয়।

ধীরে-ধীরে সবই হবে। পিস্তল বন্দুক বোমা—সব হবে। হরিবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন ফের, তোমার ডিউটি-পিরিয়ড কি বাঁধা ?

হ্যাঁ। নটা থেকে বারোটা, সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত্রি নটা। তবে আমি তত ডিউটিফুল নই। কখনও খুকুকে, কখনও রেহানাকে বসিয়ে দিয়ে ঘুরতে বেরোই।

হরিবাবু আস্তে বললেন, নেচার-বায় ছাড়ো! নেচারে কিছু নেই হে! 'হোয়াট রিমেনস ইজ ম্যান।'

দারুণ কথাটা তো! কার ?

জানি না। কোথায় যেন পড়েছিলাম। যাই হোক, অজয়কে বলো—সে তোমাকে ক্লাবের মেমবার করে নেবে। আশা করি, দেববাবুর আপত্তি হবে না। স্বাধীনের ব্যাপারে তো হয় নি!

অবাক হয়ে বললাম, স্বাধীন ওই ক্লাবে যায় নাকি ? কী করে ?

ছোরাখেলা শেখে।

একটা কথা। আপনারা কি বন্দেমাতরম্ শ্লোগান ছেড়ে দিয়েছেন।

হরিবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তোমার মাথা খারাপ ? বন্দেমাতরম্ই আমাদের প্রেরণা। বলে আমার দিকে ঘুরলেন। কেন ? তুমি কি—

দ্রুত বললাম, আমি তো এসেই আপনাকে বন্দেমাতরম্ বলে সম্ভাষণ করলাম। আপনি প্রত্যুত্তর দিলেন না।

ভেবেছিলাম, আফটার অল তুমি মুসলমান। তাই হয়তো ওভাবে দূরে সরে গিয়েছিলে। হ্যাঁ—একটা কথা। বহুকাল ধরে বলব ভেবেছি, বলি নি। ধর্মত ন্যায়ত যখন ওটা তোমারই, তখন—

কিসের কথা বলছেন ?

স্ট্যানলির পিস্তলটার কথা।

ওটা আছে।

মরচে ধরে অচল হয়ে গেছে হয়তো।

না। মাঝেমাঝে রাত্রে ওটা খুলে তেল দিই। তবে কার্তুজগুলানের অবস্থা জানি না। পরীক্ষা করে দেখব।

হরিবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, না, না। প্রয়োজনে কার্তুজ পাবে।

হাসতে-হাসতে বললাম, দূর জঙ্গলে গিয়ে টেস্ট করব।

হরিবাবু কাঁধে হাত রেখে শ্বাস ছেড়ে বললেন, ভাই শফি! লোহাগড়ার কৃষকবিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম। তবে যা হয়, মঙ্গলের জন্যই হয়। কৃষকদিগের ব্যাপারটা হল হড়কা বানের মতো। ওরা আদর্শ বোঝে না। বৈষয়িক স্বার্থ বোঝে। কিন্তু এই বিরাট কাজে আদর্শবাদেরই প্রয়োজন। আদর্শবাদ শিক্ষা ছাড়া গড়ে ওঠে না। সেই কারণে শিক্ষাব্যবস্থার সহযোগী হতে চাই আমরা। শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ নিয়েই স্বাধীনতা চাই। হরিবাবু খি-খি করে হাসতে থাকলেন। কথা আছে না ? 'যার শিল তার নোড়া / তারই ভাঙি

দাঁতের গোড়া।'

তিনি হঠাৎ মাচান থেকে নামলেন। বললেন, ভুলে গিয়েছিলাম। স্বাধীনকে রত্ন একটা চিঠি লিখেছিল। স্বাধীন তোমাকে কিছু বলে নি?

বলেছিল, আমাকে তিনি নেমন্তন্ন করেছিলেন। যাচ্ছি না কেন।

তুমি চিঠিটা নিয়ে যাও। আমার কাছে থাকা ঠিক নয়। স্বাধীনকে ফেরত দিও। বলে হরিবাবু কুটির থেকে একখানি খাম এনে দিলেন। বললেন, তুমি পড়ে দেখো। তেমন কিছু গোপনীয় নেই এতে।···

> I was once the trunk of a fig tree.
> A carpenter, doubtful whether to make me into a god or a bench, finally decided to make me a god.
>
> Satires—Horace.

"স্ট্যানলির পিস্তলটি বেঢপ গড়নের। উহার যান্ত্রিক পদ্ধতি এবং ক্রিয়াপ্রক্রিয়া সমুদয় বন্ধ ঘরে কোনো-কোনো রাত্রে নাড়াচাড়া করিতে-করিতে শিখিয়া ও বুঝিয়া লইয়াছিলাম। উহাতে চক্রাকারে আঠারোটি খোপ ছিল। স্ট্যানলি মৃত্যুর পূর্বে একটিও কার্ত্তুজ ব্যবহার করিবার সুযোগ পায় নাই। সুতরাং আঠারোটি কার্ত্তুজ খোপে সজ্জিত ছিল। সতর্কতাহেতু কার্ত্তুজগুলিন খুলিয়া অস্ত্রটি পরীক্ষা করিতাম। হরিবাবুর সঙ্গে ক্লাববিষয়ক কথাবার্তার পর একদিন বহুদূরে দুর্গম কাশবনের ভিতর গিয়া ঘোড়া টানিলাম। ফটাস করিয়া অদ্ভুত শব্দ হইল। বন্দুকের শব্দের সহিত ইহার পার্থক্য বুঝিলাম। বারিচাচাজির বন্দুকে হামার বলিয়া একটি যন্ত্র ছিল। পিস্তলটিতে তাহা ছিল না। পরবর্তী কার্ত্তুজ কীভাবে ব্যবহার করিব, তাহা নির্ণয়হেতু দ্বিতীয়বার ঘোড়া টানিলাম। কোনো শব্দ হইল না। ঝাঁকুনি লাগিল না। নিরাশ হইয়া আবার ঘোড়া টানিলাম। আবার কার্ত্তুজটি বারুদের কটু গন্ধ ছড়াইয়া শব্দ করিল। তখন বুঝিলাম দুইবার করিয়া ঘোড়া টানিতে হইবে। পরে জানিয়াছিলাম, পিস্তলটিকে অটোমেটিক কহে। কাশবনের ভিতর একটি হিজলগাছ একাকী দাঁড়াইয়াছিল। টিপ পরীক্ষা করিতে মাতিয়া উঠিলাম। গুঁড়িতে একস্থানে কাদার ক্ষুদ্র পিণ্ড সাঁটিয়া আনুমানিক কুড়িহাত দূর হইতে পদ্ধতিঅনুসারে দুইবার ঘোড়া টানিলাম। এবার দক্ষিণ হস্তে পিস্তল এবং বামহস্তে দক্ষিণহস্তের কব্জি চাপিয়া রাখিলাম, যাহাতে পিস্তলের ঝাঁকুনিহেতু নলের মুখ লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। গুলি লক্ষ্যভেদ করিল। আনন্দে লাফাইতে ইচ্ছা করিল।···

"স্বামীজিসংঘের সদস্য হওয়ার পর একটা বিষয় লক্ষ্য করি। ক্লাবঘরে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এবং সাধু-সন্ন্যাসীদিগের চিত্র লটকানো ছিল। সকলেই হিন্দু। মধ্যস্থলে দেবী কালীর প্রকাণ্ড ছবিটির সামনে দাঁড়াইয়া সকল সদস্য করযোড়ে মস্তক ঈষৎ নত করিয়া প্রণাম করে এবং অনুচ্চ স্বরে 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া প্রাঙ্গণে খেলিতে যায়। আরও একটি প্রক্রিয়া দেখি। দেয়ালের তাকে একখানি গীতাগ্রন্থ ছিল। উহার সম্মুখেও প্রণাম এবং উহাতে হাত রাখিয়া অনুচ্চস্বরে 'আমি দেশমাতৃকার জন্য প্রাণ-বলিদানে প্রস্তুত' এই বাক্যটি মন্ত্রবৎ উচ্চারণ করা হয়। ধর্মের প্রতি ঘৃণাহেতু প্রথম-প্রথম সংকোচবোধ করিতাম; মুসলমানবংশজাত বলিয়া নহে। পরে এই প্রক্রিয়ার প্রতি সংকোচ কাটিতে থাকে। বহু অহেতুক আচরণ মনুষ্যগণের মধ্যে দেখা যায়। আমি ব্যতিক্রম নহি। শঙ্খিনীর তীরে কত বৃক্ষের কাণ্ডে হাত রাখিয়া তাহাকে জীবিত প্রাণী ভাবিয়া শিহরিত হইয়াছি! এরূপ অসংখ্য আচরণে আমি অভ্যস্ত। অথচ উহার কোনোপ্রকার উদ্দেশ্য বা উহার মধ্যে কোনো কার্য্য-কারণ সম্পর্ক নাই। সুতরাং আমি সংকোচ কাটাইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু আশঙ্কা করিতাম, এই প্রক্রিয়া মুসলমানদিগের দূরে সরাইয়া রাখিবে। সত্যচরণবাবু

বলিয়াছিলেন, মুসলমানসমাজকেও আমরা সঙ্গে চাই। কিন্তু এই নিয়ম বিপ্লবীদের পক্ষে বিঘ্ন ঘটাইবে। মুসলমানগণ সম্ভবত তাঁহাদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হইবে।···

"সমস্যা হইল, আমি মুসলমানবংশজাত। এ-অবস্থায় আমি যদি এই প্রশ্নটি উত্থাপন করি, 'উল্টা বুঝিলি রাম' হইবারও আশঙ্কা আছে। উহারা ভাবিবে, আমি মুসলমান বলিয়াই এরূপ বলিতেছি। উহারা যদিও আমাকে হিন্দু সাব্যস্ত করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে আমি হিন্দু বা মুসলমান নহি, একজন মনুষ্য—দ্বিপদ প্রাণীদিগের একটি সামান্য নিদর্শন-মাত্র। এইসব ভাবিয়া প্রশ্নটি তুলি নাই। বিস্ময়ের কথা, উহাদের কাহারও মনে এই প্রশ্ন কেন জাগে না?···

"বহুকাল যাবৎ আমার একটি গোপন আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাহা অন্য কিছুই নহে, একটি ঘোড়া। ঘোড়াটি বারিচাচাজির সেই ঘোড়াটির ন্যায় তেজস্বী ও গতিশীল হওয়া চাই। এই স্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। আশ্রমবাসী ভদ্রজনেরা পাল্কী এবং অব্রাহ্ম হিন্দুসকলও পাল্কী ও এক্কা, টমটম, টাঙ্গা প্রভৃতি ঘোড়ায় টানা গাড়ি ব্যবহার করিতেন। শুধু সরকারী পদস্থ ব্যক্তি, ডাক্তার এবং পুলিশের দারোগারা ঘোড়ার পিঠে চাপিতেন। ব্রহ্মপুরে মিয়াঁ-মুসলমানের বসতি হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য স্থানে প্রায় সর্বত্র দেখিয়াছি, অধিকসংখ্যক মুসলমান ঘোড়-সওয়ার হওয়ার পক্ষপাতী। কদাচিৎ কোনো জমিদার ও বিত্তবান হিন্দু ভদ্রলোক ঘোড়সওয়ার হইতেন। অবশ্য ইহা গ্রামাঞ্চলের কথা। নগরাঞ্চলে প্রবণতা অন্যরূপ হইতে পারে। তবে ইহা হইতে আমার সিদ্ধান্ত হইল, এতদ্দেশীয় সর্বশ্রেণীর মুসলমানগণের ঘোড়সওয়ার হওয়ার প্রবণতাতে একটি ট্রাডিশনের লক্ষণ পরিস্ফুট। বহির্দেশীয় জাতিগণের ভারতজয়ের পিছনে প্রাচীন-কালে সম্ভবত অশ্বারোহণ মুখ্য উপাদানস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বেদ-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-শাস্ত্রাদিতে অশ্বচালিত রথের সগৌরব বৃত্তান্ত রহিয়াছে। কিন্তু অশ্বারোহীর কথা নাই। অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব আরোহীবিহীন অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া যোদ্ধৃবর্গ পদব্রজে তাহার অনুসরণ করিতেন। ঐতিহাসিক যুগেও দেখা যায়, বহির্দেশীয়রাই অশ্বারোহণে সক্ষম। এই যুগে যাহারা ভারতজয়ে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা সকলেই অশ্বারোহী হইয়া এই দেশে প্রবেশ করিয়াছে। আরব, তুর্কী ও মোগলগণও অশ্বারোহী হইয়া এই দেশ জয় করে। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ এবং অশ্বচালিত রথে আরোহণ এই দুইয়ে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রণে প্রবৃত্ত হওয়া আর অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া অস্ত্রচালনা করার মধ্যেও শৌর্য্য এবং গতিশীলতার প্রভূত ফারাক। প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দুদিগের মধ্যে উক্ত প্রবণতা ছিল না বলিয়াই তাহারা বিদেশীর পদানত হয়, অনুমান করি। তবে বিজিত হইবার পর বিজেতাদের সহযোগিতায় হিন্দুরা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণে মনোযোগী হয়। আমার এবম্প্রকার ধারণার কারণ, অতি সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানও অন্তত একটি অশ্ব পুষিবেই। কিন্তু সাধারণ হিন্দুদিগের মধ্যে অশ্ব পালনের দৃষ্টান্ত দুর্লভ। অশ্ব গতি, শৌর্য্য এবং দুরত্বের প্রতীক। ঋগ্বেদ সংহিতায় অশ্বসূক্ত পাঠ করিয়াছি। আর্য্য ঋষিগণ অশ্বের মধ্যে ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বিশ্বপ্রকৃতির সকল শক্তিতে তাঁহারা 'অশ্ব' কথাটিকে যুক্ত করিয়াছেন। সেই হেতু কি তাঁহারা অশ্বপৃষ্ঠে মনুষ্যের আরোহণ পাপকর্ম বিবেচনা করিতেন? যেন অমর দেবতা ছাড়া নশ্বর মনুষ্যের পক্ষে অশ্বারোহী হওয়া গর্হিত কর্ম্ম। তবে অশ্বচালিত রথে আরোহণ করার প্রথা অনুমোদন করিয়াছেন। যেহেতু—যেন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণের অধিকার শুধু-মাত্র দেবতাদিগেরই! এই ধারণার মাশুল হিন্দু-দিগকে যুগযুগ ধরিয়া গুণিতে হইয়াছে।···

"আমার বেতনের সমুদয় অর্থ সঞ্চিত ছিল। গুণিয়া দেখিলাম দুইশত টাকা জমিয়াছে। কিন্তু

কথাটি দেবনারায়ণদার কাছে তুলিলে তিনি সহাস্যে বলিলেন, তোমার দেখিতেছি ঘোড়ারোগ ধরিয়াছে। অবশ্য আমার উহাতে আপত্তির কারণ নাই। তবে ভাবিয়া দেখ, ঘোড়ার বিস্তর ঝামেলা আছে। উহার জন্য আস্তাবল আবশ্যক। খাদ্য এবং সেবাযত্ন প্রয়োজন। বলিলাম, হাজারিলাল কথা দিয়াছে, সে তাহার কুটিরের পার্শ্বে একটি চালাঘর গড়িয়া দিবে। জলাভূমিতে ঘোড়ার প্রচুর খাদ্যও আছে। সে বিহার-মুলুকের লোক। ঘোড়ার সকলকিছু অবগত। দেবনারায়ণদা উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, দেখ বাপু! ঘোড়ারোগ কঠিন রোগ। তবে ইহার সঙ্গে আমাকে জড়াইও না। তোমার ঘোড়া, তুমিই দেখিবে। আমার কী বলিবার আছে? পরদিন হাজারিলালকে সঙ্গে লইয়া রহিমপুর ঘোড়হাটায় হাজির হইলাম। অসংখ্য ঘোড়ার মধ্যে একটি সুন্দর কালো ঘোড়া পছন্দ হইল। ঘোড়া সম্পর্কে আমার বহু বৎসর পূর্বের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া বুঝিলাম, এইটি আমার উপযুক্ত হইবে। আমাকে অবাক করিয়া বিশাল গুম্ফধারী হিন্দুস্থানীটি দাম হাঁকিল, বাবুজী, দেড়শও রুপেয়া কিম্মত! ইয়ে পাহ্‌লোয়ান ঘোড়েকা মালেক ভি জবরদস্ত্‌ পাহ্‌লোয়ান থা। লেকিন উও মর গেয়া। উস্‌কা বাল্‌বাচ্চা কৈ নেহি হ্যায়। উস্‌কা জেনানা ক্যা করে? মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া টাকা গুণিয়া দিলাম। রক্ত নাচিয়া উঠিল। 'হাজারিলাল' চুপিচুপি বলিলেন, ঠকিয়াছ। এই হাটে সর্বোৎকৃষ্ট ঘোড়ার দাম একশত টাকার বেশি নহে। তাঁহার কথায় কান দিলাম না। বাকি টাকায় রেকাব-জিন-লাগাম-চাবুক সমুদয় খরিদ করিলাম। 'হাজারিলাল' সারাক্ষণ বকবক করিতেছিলেন। দুইশত টাকায় পাক্কি প্রায় দুইশতমন চাউল পাওয়া যায়! কখনও ক্ষুব্ধভাবে বলিতেছেন, অশ্বপৃষ্ঠে বিপ্লবের দিন আর নাই। বিপ্লবীরা পদাতিক না হইলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস পড়িয়া দেখ। সম্মুখসমরে ইংরাজশক্তির সহিত আঁটিয়া উঠিবে না। গুপ্তভাবে চিতাবাঘের ন্যায় আচমকা একেকটি শক্তিকেন্দ্রের টুঁটিতে কামড় বসাইতে হইবে। সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিতে হইবে। ব্যক্তিহত্যাই উদ্দিষ্ট সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সমর্থ। রহিমপুরের রাস্তায় পৌঁছিয়া একলম্ফে কৃষ্ণকায় অশ্বটির পৃষ্ঠে উঠিয়া বলিলাম, হরিদা! ইহাকে একটি নাম দিন। 'হাজারিলাল' পরিহাসবশে বলিলেন, পাহ্‌লোয়ান! আমার মনঃপূত হইল। চিৎকার করিয়া সম্বোধন করিলাম, পাহ্‌লোয়ান! পরক্ষণে চাবুক নাচাইয়া দুই হাঁটুর ধাক্কা দিলাম। ঘোড়াটি সুশিক্ষিত। ধূলিধূসর পথে বিদ্যুদ্বেগে ধাবিত হইল। আধক্রোশটাক গিয়া লাগাম খিঁচিয়া ধরলাম। গতি সম্বৃত হইল। সেখানে একটি বৃক্ষতলে নামিয়া 'হাজারিলালে'র অপেক্ষা করিতে থাকিলাম। তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই ধীরে হাঁটিতেছিলেন। মুখখানি গম্ভীর দেখাইতেছিল। পৌঁছিয়াই কিন্তু খি খি করিয়া হাসিতে থাকিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, পাহ্‌লোয়ান! পাহ্‌লোয়ানই বটে!*

"পাহলোয়ানকে পাইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলাম। কেন জানি না, আশ্রমিকরা আমার এই 'ঘোড়া-রোগ'টিকে পছন্দ করিতেন না। এই বৎসর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। গিয়াসপণ্ডিত তাঁহার কন্যা এবং গৃহস্থালিসহ আশ্রমত্যাগ করেন। এলাকায় তাঁহার বিরুদ্ধে মুসলমানদের নিন্দামন্দ ইহার অন্যতম কারণ হইতেও পারে, তবে শুনিয়াছিলাম, দেবনারায়ণদার সঙ্গে কোনো বিষয়ে প্রবল মতান্তর উহার উপলক্ষ্য। তাঁহার মতে নাকি 'ব্রাহ্মণগণ যে-ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে ব্রতী, তাহা শুধু ধর্মকেন্দ্রিক নহে, উপরন্তু মধ্যবর্তী প্রায় সাতশত বৎসরের মুসলমান

* পাহ্‌লোয়ান শব্দ মধ্যযুগীয় ফার্সি পহ্লব-জাত। পহ্লব (ঐকরা পার্থিয়ান বলত) নৃগোষ্ঠী বৃহত্তর পারস্যের একাংশের আধিপত্য করত। তাদের বীরত্বের কিংবদন্তীর সূত্রে পাহলোবান / পাহলোয়ান শব্দটি পরবর্তী যুগের ফার্সিতে চালু হয়। এই শব্দের অর্থ বীর।

শাসনকালের সভ্যতা-সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ সমন্বয়বাদী ধারাটির প্রতি তাঁহারা শীতল মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা রাষ্ট্রনীতি, সংস্কৃতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও মুসলমানদিগের কৃতিত্বের প্রতি অবলোকন করিতেছেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে দুই-চারিজন বাদে মোটামুটিভাবে সকলেই সুপ্রাচীন বৈদান্তিক এবং আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন ও সমুদয় তত্ত্বচিন্তাকেই প্রাধান্য দিতেছেন। ইহা শুভ লক্ষণ নহে। মৌলবি গিরিশচন্দ্র সেন প্রমুখ পণ্ডিত ব্যতিক্রম।'…পত্রাকারে এটি কলিকাতা হইতে গিয়াসুদ্দিন পরে আমাকে জানান এবং এ বিষয়ে চিন্তা করিতে বলেন। তিনি কলিকাতার তালতলায় তাঁহার আত্মীয় মৌলবি আফতাবুদ্দিনের নিকট আছেন। 'জাগরণ' নামে পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হইয়াছেন। 'উদার-হৃদয় কতিপয় অ-ব্রাহ্ম হিন্দুও এই পত্রিকায় লিখিতেছেন।'…

"অশ্ব-উন্মাদনাবশে ইহার প্রতি গুরুত্ব দিই নাই। মাঝেমাঝে স্বাধীন আসিয়া জানাইত, রেহানা তাহাকে পত্র লেখে। স্বাধীন মুচকি হাসিয়া বলিত, রেহানাকে বিবাহ করিলে সুখী হইতে! একদিন পুনরায় সে ওই কথা বলিলে আমিও অনুরূপ কৌতুকে বলিয়া উঠিলাম, জীবনে একজনকে বিবাহ করিলেই হয়তো সুখী হইতাম! স্বাধীন বলিল, সে কে? বলিলাম, নাম বলিব না। শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, একদা সে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে পুরুষপ্রেম বলিয়া কোনো পদার্থ নাই। স্বাধীন সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর হইয়া স্থান-ত্যাগ করিল। আমিও হাসিতে গিয়া গম্ভীর হইলাম। এই যুবতীকে কি আমি সত্যই ভালোবাসি? না তো! আমার হৃদয়ে ঠিক উহার মতোই নারীপ্রেম বলিয়া কোনো পদার্থ নাই। একদা ছিল। তাহা গলিয়াপচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে।…

"সেই বৎসর বসন্তকালে ডাকপিওন আমাকে একখানি খাম দিয়া গেল। আমার নামঠিকানা সুন্দর ইংরাজিতে লেখা। খুলিয়া চমকিয়া উঠিলাম।

'প্রিয় পুরুষমানুষ!

দাওয়াত দিয়াছিলাম। প্রতীক্ষা করিতে করিতে কি চুল পাকিয়া যাইবে? আরবি গ্রন্থে পড়িয়াছি, আরবগণের মধ্যে প্রথা আছে, দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিলে সে শত্রু গণ্য হয়। সৈয়দরা তো আরব। সংপ্রতি শ্রীমতী স্বাধীন-বালার পত্রে অবগত হইলাম, আপনাকে ঘোড়ারোগে ধরিয়াছে। উত্তম সম্বাদ। আমার প্রেমিক জিনটিরও অবস্থা তাই। সে ঘোড়ার পিঠে আমাকে চাপাইয়া পদ্মার চরে লইয়া যায়। উহার সহিত আপনাকে ডুয়েল লড়াইতে ইচ্ছা করে। চরে বসিয়া জ্যোৎস্নারাত্রে দেখিব, দুই ঘোড়সওয়ার ডুয়েল লড়িতেছে। অধিক বাক্য নিষ্প্রয়োজন। ইতি—র।

পুনশ্চ: পিতৃদেব তাঁহার প্রিয়তমাসহ কলিকাতা গমন করিয়াছেন। তাই বলিয়া আতিথেয় ত্রুটি ঘটিবে না। মুন্সিচাচাকে আপনার কথা বলিয়াছি।'…

"মনস্থির করিতে দুইদিন কাটিয়া গেল। হরি-বাবুকে জানাইব কি না, ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলাম, কাহাকেও কিছু জানাইব না। তবে দেবনারায়ণদাকে বলিতে হইল, বহু বৎসর হইল পিতামাতার চরণদর্শন করি নাই। তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন। পরদিন প্রত্যূষে যাত্রা করিলাম। কৃষ্ণপুর উত্তরপূর্ব কোণে বিহার সীমান্তে অবস্থিত। দূরত্ব প্রায় আট-নয়ক্রোশ হইবে, শুনিয়াছি। পথিমধ্যে দুই স্থানে বিশ্রাম করিলাম। একবার পথ ভুল করিলাম। গ্রামসমূহের মধ্য দিয়া যাইবার সময় লক্ষ্য করিলাম, সকলেই সপ্রশংস দৃষ্টে আমাকে দেখিতেছে। ভাবিতেছে, না জানি কোন জমিদার-নন্দন হইবে! তৎকালে হিন্দু জমিদারদিগকে তাঁহাদের হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজা রাজা বলিয়া উল্লেখ করিত। জমিদারবাটীকে 'রাজবাড়ি' বলিত। মুসলমান জমিদারের সংখ্যা জেলায় মুষ্টিমেয়। তবে তাঁহা-দিগকে প্রজারা 'নবাব' বলিত না, জমিদারই বলিত। নবাব বলিতে জেলায় শুধু লালবাগের নবাববাহাদুর।

ইংরেজ বহু জমিদারকে বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে রাজা খেতাব দিত। তাছাড়া মুসলমান শাসনকালের রাজা খেতাবপ্রাপ্ত কিছু জমিদারও ছিলেন।…

"মাটির রূপ বদলাইতেছিল। বন্ধুর, বৃক্ষবিরল, উষর প্রান্তর চতুর্দিকে। বামদিকে সড়ক ঘুরিল। ক্রমশ বৃক্ষলতাগুল্মাদি দৃষ্টিগোচর হইল। সমতলভূমি ও শস্যক্ষেত্রে শ্যামলতা ক্লান্তি দূর করিল। এতক্ষণে বিশাল পদ্মা উত্তরে বিলম্বিত দেখিলাম। তাহার বিশালতা মনোমুগ্ধকর। ক্রোশটাক দূরত্বে কিছু ইটের বাড়ি দেখিতে পাইলাম। রাস্তায় টাঙ্গা, এক্কা এবং বলদগাড়ির প্রাচুর্য দেখিয়া বুঝিলাম কৃষ্ণপুর সমৃদ্ধ গঞ্জ হইবেক। এইবার দেহে মুহুর্মুহু শিহরন ঘটিতে থাকিল। গঞ্জে ঢুকিয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে 'রাজবাড়ি'র রাস্তা দেখাইয়া, এমন কী আমার পশ্চাতে হন্তদন্ত আসিতে থাকিল। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, রাজবাড়ির চতুর্দ্দিকে গভীর পরিখা। সম্মুখস্থ ফটকের দরজায় একজন সঙীনধারী প্রহরী এবং অপর একজন গোর্খাপ্রহরী কুকরি কোষবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরিখার কাঠের সেতু পার হইলে তাহারা সেলাম দিল। বলিলাম, মুন্সী আবদুর রহিমকে সম্বাদ দাও। আমি ব্রহ্মপুর আশ্রম হইতে আসিতেছি। লালবাগের হাভেলিতে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, সঙীনধারী একটি দড়ি ধরিয়া টানিল। ভিতরে আবছা ঘণ্টার শব্দ হইল। বদ্ধ বিশাল কপাটের একাংশে ঘুলঘুলিতে একটি মুখ ভাসিয়া উঠিল এবং অদৃশ্য হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কপাটের একটি ফোকর খুলিয়া একজন বৃদ্ধ মুসলমান বাহির হইলেন। তিনি যেন ভড়কাইয়া গিয়াছিলেন। মৃদুস্বরে তিনি কিছু বলিলে প্রহরীদ্বয় কপাট খুলিয়া দিল। বলিলাম, আপনিই কি মুন্সীজী? তিনি মৃদু হাস্যে মাথা দোলাইলেন। বলিলেন, আসুন। চারদিকে উচ্চ প্রাচীর, প্রাঙ্গণে বাগিচা, মর্মরমূর্তি, কেন্দ্রে দ্বিতল একটি প্রাসাদ। অন্যদিকে সারবন্দি একতলা ঘর। অনুরূপ একটি ফটক দৃষ্টিগোচর হইল। ঘোড়া হইতে নামিলে একজন লোক ছুটিয়া আসিয়া আমার হাতের লাগাম সবিনয়ে গ্রহণ করিল। মুন্সীজী বলিলেন, আপনার ঘোড়ার সেবাযত্নের ত্রুটি হইবেক না। মকবুল সহিস ঘোড়ার সহিত বাক্যালাপে পটু। বুঝিলাম, ইনি রসিক ব্যক্তি।…

"প্রকাণ্ড হলঘরে দেয়ালচিত্র, জানোয়ারের স্টাফ-করা মস্তক, প্রকাণ্ড শ্বেতপাথরের টেবিল, বিবিধ আসন সজ্জিত। ঝাড়বাতি ঝুলিতেছে। মুন্সীজী আমাকে একটি আসনে বসাইয়া একজন ভৃত্যকে দিয়া খবর পাঠাইলেন। বলিলেন, গোবিন্দবাবু মহালে গিয়াছেন। রাজাবাবুও কলিকাতায়। তবে কোনো ত্রুটি ঘটিবেক না। এই সময় ভৃত্যটির সঙ্গে হলঘরের একপ্রান্তের গালিচা-মোড়া সোপান বাহিয়া ঝর্ণাধারার মতন রত্নময়ী নামিয়া আসিল। সে 'আসসালামু আলাইকুম' সম্ভাষণ করিল না। হাস্যমুখে শুধু কহিল আমার সৌভাগ্য! আসুন। তাহাকে অনুসরণ করিলাম। মুন্সীজী হয়তো স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। দ্বিতলে বারান্দা দিয়া ঘুরিয়া উত্তর-পূর্বকোণে একটি সুসজ্জিত ঘরে ঢুকিয়া রত্নময়ী বলিল, ওই দেখুন পদ্মা! ওই সেই চর। তাহাকে সেদিনকার মতন অপ্রকৃতিস্থ দেখাইতেছিল না। বলিলাম, এ ঘরে কে থাকে? রত্নময়ী বলিল, দাদা থাকিতেন। এক্ষণে আপনি থাকিবেন। দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া বলিলাম, আমার জন্য আপনি ঝামেলায় পড়িবেন না তো? রত্নময়ীর কোটরগত চক্ষুদুটি জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, একজন মুসলমানীবাইজী অপেক্ষা একজন সৈয়দবংশীয় পীরের সন্তানের স্পর্শে এই প্রাসাদ কি অপবিত্র হইবে? বরং এক্ষণে জাহান্নাম বেহেশতে পরিণত হইল। ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, কিন্তু আমি তো ধর্মবিশ্বাসী নহি। সুতরাং বাইজী অপেক্ষাও নারকী শয়তান! রত্নময়ী শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলিল, ডোণ্ট নো দ্যাট স্যাটান ওয়াজ ওয়ান্স অলসো অ্যান অ্যাঞ্জেল ইন দা সেমিটিক ট্র্যাডিশন? চমকিত হইয়া বলিলাম, হ্যাঁ, তাহা সত্য। সেই নাকি বিশ্বের প্রথম বিদ্রোহী। শয়তান সর্বচর—

অবাধ তাহার গতিবিধি। ইহার অর্থ, বিদ্রোহই কোনো সত্ত্বাকে প্রকৃত স্বাধীন করে। বিদ্রোহই স্বাধীনতার প্রবাহে ভাসাইতে পারে। রত্নময়ী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঠোঁটের কোণে হাসির কণা রাখিয়া বলিল, এত স্বাধীনতার গৌরব প্রচার কেন? আশা করি, স্বাধীনবালার প্রেমে পড়েন নাই? হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, খুকু অর্থাৎ স্বাধীন বলে, তাহার হৃদয়ে পুরুষপ্রেম বলিয়া কোনো পদার্থ নাই। আমিও তদ্রূপ প্রেমহীন পুরুষ। রত্নময়ীর কী হইল, সহসা আমার পায়ে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া আস্তে কহিল, ইউ আর অ্যান অ্যাঞ্জেল!…"

(ক্রমশ)

এম. এন. রায়ের শতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ রচনা :

মানবেন্দ্রনাথের মানসলোক

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

চতুরঙ্গের ডিসেমবর ১৯৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত
এই সংখ্যা চতুরঙ্গ দপ্তরে এখনও কিছু পাওয়া যাচ্ছে

দলিত সাহিত্য

বীণা আলাসে

অকটোবর ১৯৩৫-এ প্রয়াত দলিত-নেতা ড. ভীমরাও (ওরফে বাবাসাহেব) আম্বেদকর ধর্মান্তরিত হওয়ার সময় ঘোষণা করেন : 'আমি হিন্দু হয়ে জন্মেছি, কিন্তু হিন্দু হয়ে মরব না।' ওঁর এই ঘোষণায় সাড়া দিয়ে ১৯৫৬ সালে নাগপুরের এক বিশাল ময়দানে পাঁচ-ছয় লক্ষ মানুষ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে বাবাসাহেবের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন ভিক্ষু মহাথেরো চন্দ্রমণি। সেই দিন থেকে মহারাষ্ট্রের দলিতদের মুক্তিসংগ্রামের এক নতুন পর্বের সূচনা হয়। ১৯২০ সাল থেকে বাবাসাহেব যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার সাফল্যের প্রতিফলন হল এই দীক্ষাভূমিতে। লক্ষ-লক্ষ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল—আজ বৌদ্ধ হলাম, মানে মানুষ হলাম, মানুষ হয়েই বাঁচব।

কেন এই ধর্মান্তর? জাতিভেদপ্রথার প্রতি কেন এত প্রচণ্ড ক্ষোভ?

১৯৩২ সাল থেকেই মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা-নিবারণের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তবু কেন এত অশান্তি—এত লাঞ্ছনার জ্বালা? কারণ: গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা-নিবারণের পিছনে অস্পৃশ্যদের প্রতি দয়া দেখাবার ভাবনা প্রকাশ পেত। কিন্তু ড. আম্বেদকর ছিলেন মূলগামী ক্রান্তির অগ্রদূত—তিনি কিছুতেই গান্ধীজীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তিনি সমানে বলে গেছেন : 'আমরা দয়া চাই না, নিজের অধিকার চাই।' "হরিজন"-শব্দটির তিনি নিন্দা করেন—এই শব্দ-ব্যবহারেই একটা উচ্চবর্ণীয় অহংকার ধরা পড়ে। তিনি তাঁর "অ্যানিহিলেশন অব কাস্ট্‌স্" বইতে নিজের মত, এবং দলিতদের আত্মসম্মানের, অধিকারের কথা স্পষ্টভাবে লিখেছেন। তারপর ১৯৪১ সালে অখিল ভারতীয় অস্পৃশ্য সমাজের রাজনৈতিক দলের জন্ম হয় : "সেডিউল কাস্ট্ ফেডারেশন"। এই দলের পতাকার নীচে ১৯৪৬, ১৯৫২, ১৯৫৪ সালে যথাক্রমে পুনে, নাগপুর, লখনউ আর ঔরঙ্গাবাদে প্রচণ্ড গণ-সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম এগোতে থাকে।

ঔরঙ্গাবাদে "মিলিন্দ মহাবিদ্যালয়" নামে কলেজ স্থাপিত হয় অস্পৃশ্য ছেলেমেয়েদের জন্য। এই কলেজের উদ্বোধনভাষণে বাবাসাহেব বলেছিলেন, 'তোমরা বিনয়শীল হবে, কিন্তু অন্যায় আর অত্যাচার সহ্য করা বিনয়শীলতা নয়। ওটা কাপুরুষতা।'

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগে গান্ধীজীর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে বাবাসাহেব বলেছিলেন, 'গান্ধীজী, আই হ্যাভ নো হোমল্যানড।' এই কথাগুলির পিছনে যেন ভারতের লক্ষ-লক্ষ পীড়িত অবহেলিত মানুষের গভীর বেদনার মহাসাগরের উথালপাথাল। তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন, আমাদের সমাজের শোষক কেবল ব্রিটিশরাই নয়—আমাদের দেশের লোকও আমাদের শোষণ করে; কাজেই ব্রিটিশ চলে গেলেও আমাদের মুক্তি নেই। বর্ণব্যবস্থাই হচ্ছে ভারতের কোটি-কোটি অস্পৃশ্যদের প্রথম এবং শেষ শত্রু। উচ্চবর্ণীয়দের সঙ্গেই তাঁদের লড়াই। এঁরাই যুগ-যুগ ধরে এই দলিত-দের দলন করেছেন। তাঁদের শিক্ষা আর ধনসংগ্রহে বাধা দিয়ে এই উচ্চবর্ণীয়রাই বিরাট ষড়যন্ত্র করে তাঁদের গরিব, বোকা আর নোংরা করে রেখে নিজেদের সুবিধা করে নিয়েছেন। ধর্মের নামে, পূর্বজন্ম-পুনর্জন্মের ভয় দেখিয়ে এঁরাই তাঁদের গ্রামের বাইরে বস্তিতে রেখেছেন। কারণ: অস্পৃশ্যরা নাকি নোংরা! 'কে করেছে আমাদের নোংরা? কেন আমরা ইঁদারার জল পেতে পারি না? জল না পেলে কী করে আমরা পরিষ্কার থাকব? জল ছুঁতে না দিয়ে, মানে, জলের অভাব সৃষ্টি করে এঁরা আমাদের নোংরা থাকতে বাধ্য করেছেন। অথচ, প্রকাশ্যে আমাদের গালাগাল দেবেন।'

দলিতদের এই ক্ষোভ এতই গভীর আর সত্য যে তাঁদের সামনে আজকের শিক্ষিত উচ্চবর্ণীয়দের কোনো তর্ক টিকতে পারে না। ভারতবর্ষ দেশটা স্বাধীন হওয়ার পর দলিতদের শিক্ষিত প্রজন্মের প্রথম আবির্ভাব হয়। তাদের চোখ খুলে যায়। তারা বুঝতে পারে এদেশের সংস্কৃতির আসল চেহারা, এই দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে স্বার্থান্ধ সংকীর্ণতা, এবং এই সমাজের স্তরে-স্তরে জমে-থাকা সামাজিক অসমতা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দলিত সাহিত্যের সৃষ্টি হয় ষাটের দশকে। দলিতদের প্রথম-শিক্ষিত প্রজন্ম যখন বেদ, পুরাণ, মহাকাব্য এবং মধ্যযুগীয় সন্তসাহিত্য পড়েন, তখন বুঝে যান এদেশের সমস্ত সাহিত্য উচ্চ-বর্ণীয়দের সৃষ্টি। দলিতদের পূর্বপুরুষরা যে তখন কোথায় ছিলেন, কোন্ অবস্থায় ছিলেন তার কোনো কথা এই সাহিত্যে নেই। তাঁদের পূর্বপুরুষদের একেবারেই অগ্রহণীয় অপাঙক্তেয় ভেবে নেওয়া হয়েছে, ইচ্ছা করে ঘোর অন্ধকারে ঢেকে ফেলা হয়েছে। তাঁদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ঘোর অন্ধকার।

এখন অবশ্য আইনে দলিতদের সমস্ত অধিকার দেওয়া হয়েছে। অস্পৃশ্যতা বলে কোনো ব্যাপার আইনে নেই। কিন্তু আধুনিক দলিত লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে বলেন, আইনের অধিকার শুধু কাগজে-কলমে; সে অধিকার ভোগ করার জন্য চাই সমাজের পরিবর্তন। বর্ণব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ। বিশাল ভারতবর্ষের চার-পাঁচটি বড়ো-বড়ো শহরে সামান্য একটু পরিবর্তন দেখা গেলেই কি সমগ্র অবস্থা পালটে যায়? গ্রামাঞ্চলে কী হচ্ছে? এখনও শূদ্রদের ঝোপড়িগুলো গ্রামসীমার বাইরে। এখনও তাঁরা তথাকথিত ভদ্রসমাজে মিশতে পারেন না। সব জায়গায় পুকুর আর ইঁদারা ওঁদের জন্য খোলা নয়। যুগ-যুগ ধরে যা চলে আসছে, এখনও গ্রামাঞ্চলে সেই একই ছবি। তাহলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ কী? এ কার স্বাধীনতা? কিসের জন্য স্বাধীনতা?

দলিত সাহিত্যে এই মানবতাবঞ্চিত শূদ্রমানুষের যন্ত্রণা শব্দমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা বলতে চান : আমরা মানুষ। কবি প্রহ্লাদ চেন্দ্‌ভণকর লেখেন,

> আমি ভোরের স্বপ্ন দেখছি
> এই গ্রামাঞ্চলের বাইরের
> অন্ধকারের অন্ত হবে।

আমার ঠোঁটে জাগবে আলোর গীত
মাতাল করবে দশদিশ—
এসো হে সবাই মিলে, হাতে হাত বেঁধে
আলোর গীত গাই।

দলিত সাহিত্যের উদ্ভব আর বিকাশের কথা বলার আগে আরও একটি কথা স্পষ্ট করা উচিত। এই সাহিত্যে দারিদ্র্যের উল্লেখ প্রচুর পাওয়া যায়, তাই অনেকে এই আন্দোলনকে শ্রেণীসংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন। মহারাষ্ট্রেও এমন চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারণ, দলিত লেখকরা তাঁদের দারিদ্র্যের মূল খুঁজে পান পরম্পরাগত সামাজিক বর্ণব্যবস্থার মধ্যে। মনুস্মৃতিতে শূদ্রদের সম্বন্ধে যেসব কথা বলা আছে তা আমরা জানি। তাই, বাবাসাহেব আম্বেদকর মনুস্মৃতির সমগ্র স্বরূপ দেখে তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে লেখেন, Caste system is not a division of labour. It is also division of labourers in watertight compartments.

আজকের শিক্ষিত দলিত যুবক মনুস্মৃতি পড়েই বুঝতে পেরেছেন, তাঁদের দারিদ্র্য আজকের নয়। ওটা একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের পরিণাম। কাজেই, আজকের শ্রেণীসংগ্রাম থেকে ওটা ভিন্ন। দলিতরা যে দারিদ্র্যের কথা বলেন সে দারিদ্র্য বর্ণব্যবস্থার ফল। তাই একজন শিক্ষিত দলিত যুবক আর একজন শিক্ষিত উচ্চবর্ণীয় যুবক—দুজনেই আজ সহকর্মী হলেও, সমান বেতন পেলেও, দলিত যুবকের সমস্যা অনেক বেশি। তাঁকে সবকিছুই প্রথম থেকে শুরু করতে হয়। সোনারুপো তো দূরের কথা, তাঁর বাড়িতে কোনো ধাতুর দু-চারটে বাসনও খুঁজে পান না। এসব প্রয়োজনীয় জিনিস জোগাড় করেও দেখতে পান, তাঁর আত্মীয়রা পুরোপুরি অজ্ঞ। জল পেলেও ওঁরা জলের ব্যবহার জানেন না। ভালো ভাষা জানেন না, ভদ্র ব্যবহার জানেন না, পড়াশুনা করতে চান না। এসব দেখে তাঁর মনে নতুন করে জেগে ওঠে পরম্পরাগত বর্ণব্যবস্থার প্রতি তীব্র ক্ষোভ আর দুরন্ত ক্রোধ। তাই শ্রীভারসাওলেকর লেখেন,

হে মনু,
এই শতকের দ্বারে দাঁড়িয়ে
আমি এক দলিত প্রশ্ন করি
আমার হাতে তুমি অস্ত্র দাও নি কেন?
(আমি এদেশকে কোনোদিন পরাধীন গোলাম
হতে দিতাম না)
আমাকে তুমি অক্ষরশত্রু করে রেখেছ কেন?
(আমি অন্তত এদেশের সত্যিকার ইতিহাস লিখতাম)
বর্ণব্যবস্থার ধাপ তৈরি করে
তুমি আমায় পশুর মতো রেখেছ।

দলিত সাহিত্য হচ্ছে দলিতদের চিরন্তন বেদনা আর বিদ্রোহের দর্পণ। এ সাহিত্যে ভাষার বাহার দেখা যাবে না, দেখা যাবে না অলংকারময় বিদগ্ধ সৌন্দর্য। বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁদের মার্গ-প্রদর্শক।

বাবাসাহেবের আগেও মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে, কিষণ ফাগু বণসোড়ে, সাহীর খেগড়ে, হরিহররাও সম্বুলে প্রমুখ সমাজসংস্কারক আর সাহিত্যিক দলিত-দের বেদনা আর বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বাবাসাহেবের নেতৃত্ব ছিল সার্থকতর। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, হৃদয়স্পর্শী ভাষা, ধারালো কলম, সুচারু ব্যক্তিত্ব এবং প্রজ্ঞা—এইসব মিলেই তৈরি হল দলিতদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বর্ণব্যবস্থার দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে যাঁরা দারিদ্র্যকে, কষ্টের জীবনকে দৈব বলে মেনে নিয়েছিলেন, এবং যাঁদের মনকে ধর্মের সম্মোহনে ঘুম পাড়িয়ে নিজেকে হীন বলে মেনে নেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, তাঁরাই মানসিক দাসত্ব ছুঁড়ে ফেলে নামলেন আত্মোপলব্ধির সংগ্রামে। দলিত লেখকরা তাই গৌতম বুদ্ধ, চার্বাক, কার্ল মার্কস, আম্বেদকর, লেনিন, মাও সেতুঙ, হো চি মিন, ম্যালকম এক্স্—এঁদের সকলের কাছ থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেন। সঙ্গে-সঙ্গে, নিগ্রো কবিদের আকর্ষণও এই লেখকদের কাছে অনেক বেশি। কারণ, সহজেই বোঝা যায়, উনিশ শতকে আব্রাহাম লিঙ্কন নিগ্রোদের দাসপ্রথার কারাগার থেকে উদ্ধার করেন। নিগ্রোদের সংগ্রাম অনেকটাই দলিতদের মতো। তাই ল্যাঙস্টন হিউজ, রিচার্ড রাইট, রলফ ওলিসন, মারগারেট ওয়াকার প্রমুখ কবিদের রচনা দলিত লেখকদের আপন বলে মনে হয়। 'দলিত কবিরা নিগ্রো কবিতাকে নিজের বড়ো বোনের মতো মনে করেন'—লিখে গেছেন কেশব মেশরাম তাঁর "বিদ্রোহী কবিতা" বইয়ের ভূমিকায়।

দলিত সাহিত্যের সূচনা খুঁজতে গেলে মনে পড়ে ১৯৬৭ সালে ঔরঙ্গাবাদে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনা-চক্রের কথা। বিষয় ছিল : মহারাষ্ট্রের আজকালের সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ আর সাহিত্যিক সমস্যা। ১৯৬৮ সালে "অস্মিতাদর্শ" ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হল। এই পত্রিকায় উল্লিখিত আলোচনা মুদ্রিত হল। আলোচনার জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছিল। সেটা কবি, বুদ্ধিজীবী এবং আলোচকদের দেওয়া হয়েছিল। "মারাঠওয়াড়া" দৈনিকে এই প্রশ্নমালা ছাপা হয়েছিল। এই আলোচনাচক্রে ড. ওয়ানখেড়ে, বাবুরাও বাগুল, নামদেব চসাড় প্রমুখ দলিত লেখকরা দলিত সাহিত্যের ভূমিকা এবং স্বরূপের ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করেন।

দলিত সাহিত্যিকরা কয়েকটি মিথ বারংবার ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, কর্ণ, অশ্বত্থামা, একলব্য, ঈডিপাস ইত্যাদি দেশী-বিদেশী পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব প্রায়ই প্রতীক হিসাবে আসে। কেননা, ওই চরিত্রগুলি তাদের জন্মের জন্য, বংশের জন্য, জাতির জন্য দুঃখভোগ করেছিল। তাই এদের মধ্যে নিজেদের দুঃখের মিল খোঁজা হয়। এদের কথা বলে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশের পথ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, দয়া পাওয়ার লেখেন,

সাবধান,
হয়তো ঠিক শব্দভেদ করতে পার বলে
তোমাদের কয়েকজন একলব্যের
আঙুল আঙুল কাটা হচ্ছে
এখনো তুমি কার অপেক্ষায় বসে আছ?
ত্র্যম্বক সপকালে লিখেছেন,
নাড়ি কাটতে না কাটতেই
নিজের জীবনস্রোত থেকে ছিঁড়ে ফেলে আমায়
হে ভারতমাতা!
কখনো প্রেম বাৎসল্য দিয়েছ?
এই কালপ্রবাহে যদি কর্ণ না হয়ে
ঈডিপাস হয়ে তোমার শয্যায় উঠে পড়ি
তাহলে আমার কী দোষ?

দলিত সাহিত্যে কবিতাই বেশি লেখা হয়েছে। এ-সমস্ত কবিতাই ওঁদের পীড়ার, বিদ্রোহের আর যন্ত্রণার কবিতা। মানবতাবাদী কবিতা। ওঁদের নিজস্ব একটি ভঙ্গি আছে, ভাষা আছে। নামদেব চসাড় একজন প্রখ্যাত দলিত কবি। তাঁর কাব্যসংগ্রহের নাম "গুলপীঠা"। এতে কবি নিজস্ব ভঙ্গিতে বস্তির নিদারুণ শোষণ জীবন্ত করে তুলেছেন। মার্জিত ভাষাকে চসাড় সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে বস্তির ভাষা ব্যবহার করেছেন। অনেক ভদ্রলোকের কানে ওঁর ভাষা অশ্লীল মনে হয়। তবু নামদেব ইচ্ছা করেই ওই ভাষা ব্যবহার করেন।

যশবন্ত মনোহর আর-একজন প্রখ্যাত দলিত কবি—কাব্যসংকলনের নাম "উত্থান ওমফা"। কিন্তু তাঁর রচনাভঙ্গিটি স্বতন্ত্র। তাঁর কবিতায় বিদ্রোহের সঙ্গে-সঙ্গে পাই প্রচণ্ড ভাবাবেগ। মনোহর চিত্রকল্প আর গভীর চিন্তা তাঁর লেখায় প্রকাশ পায়। এ ছাড়া, কেশব মিশ্রম, বামন নিম্বরকর, নরেশ ইঙ্গলে, দয়া পাওয়ার, ত্র্যম্বক সপকালে, অর্জুন ডাংলে, প্রহ্লাদ চেন্দ্‌ভণকর, য. বি. পাওয়ার, প্রকাশ যাদব—এই-রকম ৩০-৪০ জন সার্থক দলিত কবির কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

দলিত ছোটোগল্প চল্লিশের দশক থেকেই লেখা হচ্ছিল। তাতে শঙ্কররাও খারাত, আন্নাভাউ সাঠে, বন্ধুমাধব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা নীচুতলার

মানুষের জীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন, তাঁদের বেদনা-যন্ত্রণার কথা বলেছেন। কিন্তু দলিত বিদ্রোহের উগ্রতা তাতে ছিল না। তাঁরা প্রধানত মানবতাবাদী লেখক। দলিত বিদ্রোহের সমগ্র দর্শন আমরা পাই বাবুরাও বাগুলের গল্পে। বাবুরাও প্রকৃত কবি, তাই তাঁর বিদ্রোহের ভাষাও কাব্যময়। দুঃখের ভারে নিষ্পেষিত মানুষের জীবনভাবনা এইসব গল্পে প্রতিফলিত। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমাজের সঙ্গে এইসব গল্প বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়। যোগিরাজ বাঘমারে, অমিতাভ, যোগেন্দ্র মিশ্রম, বামন হোয়ার, অর্জুন ডাংলে, কেশব মিশ্রম—এঁরাও গল্পকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। এঁদের গল্পে দলিত বিশ্ব আত্মপ্রকাশ করেছে—যেন একটা গাঢ় অন্ধকার কথা বলতে শুরু করেছে, একটা দৃষ্টিহীন সমাজ সূর্যের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে।

গত কুড়ি বছর ধরে অনেক দলিত লেখক এগিয়ে এসেছেন আত্মকাহিনী লিখতে—আত্মকথা হয়ে উঠেছে দলিত সাহিত্যের এক সমৃদ্ধ ধারা। এইসব কথায় আমরা পাই ওঁদের দুঃখ, দাসত্ব, দারিদ্র্য এবং অন্যায়-অত্যাচারের দলিল। নিরক্ষরতা, কুসংস্কার ইত্যাদির দ্বারা এই দলিত সমাজ সত্যিকার জীবনের সঙ্গে সংযোগহীন হয়ে বেঁচে ছিল। ভাববিশ্ব বলে ওঁদের কোনো-কিছু ছিল না, চিন্তাশক্তি কল্পনাশক্তি ছিল মৃতপ্রায়। কিন্তু এই-সমস্ত জীবন এখন নিজের কথা বলতে উদ্যত। বিখ্যাত আত্মকাহিনী হল সোনকাম্বলের "আঠভনিন্‌চে পক্ষী" (স্মৃতির পাখি), লক্ষ্মণ মানের "আরা" (বহিরাগত), দয়া পাওয়ারের "বলুত" (লাঙলের ফলা), মাধব কোন্‌দভিলকরের "মুক্কাম পোস্ট্ দেওয়াচে গোঠাণে", শঙ্কররাও খারাতের "তরাল, অন্তরাল", কেশব মিশ্রমের "হকিকত আণি জটায়ু" (বাস্তব এবং জটায়ু), রুক্তম আঁচল-খাম্‌বের "গাঁওকী" (গ্রামের রীতি)। এঁরা সকলেই ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক অন্যায় সহ্য করেছেন। তাই এইসব লেখায় আমরা পাই প্রচণ্ড রোমাঞ্চকারিতা, এগুলি আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

শঙ্কররাও খারাত, বাবুরাও বাগুল, কেশব মিশ্রম, সুধাকর গায়কোয়ড়—এঁরা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেছেন। এগুলির মধ্যে ভাষা পেয়েছে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দলিতদের সংগ্রাম, তাঁদের মানবাধিকার অর্জনের আশা। চরিত্রনির্মাণ জীবন্ত, প্রাণশক্তিতে ভরপুর। "ফকিরা" (ভ্রাম্যমাণ), "তিসরী লাট" (তৃতীয় ঢেউ), "সূড়" (প্রতিশোধ) প্রভৃতি উপন্যাস বিশেষ বিখ্যাত।

দলিত আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছে নাটক—প্রধানত একাঙ্কিকা। দত্তা ভগত, প্রভাকর দুসাড়ে, কমলাকর ডাহাট, প্রেমানন্দ গজবী নাট্যরচনায় নাম করেছেন। দলিত নাট্যশালার আবির্ভাব আসন্ন।

দলিত সাহিত্যের স্বরূপ এবং সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে অনেকে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখনীয় ম. ভি. চিটনীজ, গমবা সরদার, রা. ভি. জোশী, নরহর কুরুন্দ্‌কর, নির্মলকুমার ফড়কুলে, ড. ম. না. ওয়ানখাড়ে, বা. গ. যাদব, যশবন্ত মনোহর, বালকৃষ্ণ কাশঠেকর। এই প্রবন্ধকারেরা দলিত সাহিত্যের নির্মিতিপ্রক্রিয়া, প্রেরণা, আস্বাদন-প্রক্রিয়া নিরূপণে প্রয়াসী। প্রয়াসটি নতুন, কাজটি সহজও নয়, সার্থকতা অর্জনে কিছুটা সময় লাগবে।

দলিত সাহিত্য দেশের মাটি থেকে উঠে এসেছে—এখন এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে গুজরাতে, কর্ণাটকে। ফ্যাশনেবল পাশ্চাত্ত্য প্রভাব এ সাহিত্যে পাই না। তাই মনে হয়, দেশের মাটির আরও গভীরে শিকড় নামিয়ে দিতে পারবে এই দলিত আন্দোলন, দলিত সাহিত্য। কারণ, দলিত সাহিত্যিকরা লিখছেন নিজেদের কথা, নিজেদের সমাজের কথা, আত্মযন্ত্রণার কথা। তাঁরা নৈরাশ্যবাদী নন, নিজেদের তাঁরা বলেন

'আলোর পথিক'। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল প্রভাতের সন্ধান করছেন তাঁরা। এই জীবনাভিমুখিতা ব্যর্থ হতে পারে না। লব্ধপ্রতিষ্ঠিতদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা বলছেন :

It may be your interest
to be our master.
But how can it be ours
to be your slaves.

মুদ্রণপ্রমাদ

মার্চ সংখ্যায় তিনটি ছাপার ভুল থেকে গেছে। পাঠকরা অনুগ্রহপূর্বক সংশোধন করে নিয়ে বাধিত করবেন।

১। পৃষ্ঠা ৮৯০, লাইন ২৮, শুদ্ধ পাঠ—প্রক্ষুব্ধ কত সমুদ্রে দীর্ঘ সময় ভেসে বেড়াতে অভ্যস্ত

২। পৃষ্ঠা ৮৯১, লাইন ৩, শুদ্ধ পাঠ—দেশের নানা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত তিলোত্তমা তুমি আত্মার প্রতিমা।'

৩। পৃষ্ঠা ৯১৮ : "শ্রাবণ" পত্রিকার সম্পাদকের নাম মনজুরে মওলা।

গোরখাল্যানড সম্পর্কে

পুলকনারায়ণ ধর

দার্জিলিঙ পশ্চিম বাঙলার সবচেয়ে সুন্দর আর মনোরম স্থান। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই নয়, সেই অঞ্চলের মানুষের উষ্ণ, আন্তরিক ভালোবাসা আর মধুর ব্যবহার তো সকলকে মুগ্ধ করে। কিন্তু সম্প্রতি এই শান্ত মানুষরা হঠাৎ অশান্ত হয়ে উঠেছেন এবং এমন কিছু দাবি করছেন যা তাঁদের পূর্ব পরিচয় ধুয়েমুছে দিচ্ছে। তাঁদের দাবি ন্যায্য কি অন্যায্য, সে বিতর্কে আমি যাচ্ছি না। আমার কাছে একটা প্রশ্নই বড়ো হয়ে উঠে এসেছে। তা হল দার্জিলিঙের মানুষরা জি. এল. এন. এফ. (গোরখা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট)-এর ডাকে এমন বিপুলভাবে সাড়া দিলেন কেন? সবাই না হোক, নিঃসন্দেহে গোরখাদের একটা বড়ো অংশ আন্দোলিত হয়েছে। এই বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। অথচ এই ঘটনাটা এমনভাবে উপস্থিত করা হচ্ছে যেন হঠাৎ শান্ত মানুষগুলোকে বাইরে থেকে অন্য কোনো স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী খেপিয়ে তুলেছে। বাইরের হস্তক্ষেপ যদি থেকে থাকে তবে তা কার হস্তক্ষেপ তা আমরা জানি না। তার কোনো প্রমাণ কোনো মহলই সাধারণ মানুষের কাছে দাখিল করতে পারে নি। সরকারি স্তরে সম্ভব না হলেও অন্ততপক্ষে রাজনৈতিক বা দলীয় স্তরে তা করা যেতে পারত। তাও হয় নি। তা যদি হত তবে হয়তো এত আলোচনা বা এই লেখাটি লেখারও প্রয়োজন থাকত না। আসলে আমরা সমস্যার গভীরে না গিয়ে তাকে বাইরে থেকে বিচার করতে বেশি পছন্দ করি। কারণ তাতে মাথা ঘামাতে হয় কম। এতে তৈরি-করা 'ফরমুলা' বা ছকে ফেলে একটা চটপট সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়। এবং যদি নিজেদের কোনো দোষত্রুটি থাকে তবে তা সহজে ঢেকে দেওয়া যায়। তাতে প্রচলিত রাজনীতির চালগুলো বজায় রাখা যায় (এটা রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য)। দার্জিলিঙের ঘটনা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। অনেক দিনের জমে-থাকা ক্ষোভ আর বঞ্চনা দার্জিলিঙের পাহাড়ি মানুষগুলোকে খেপিয়ে তুলেছে। তাদের এই বিক্ষোভের মধ্যে আছে বহু যুগের ঘৃণা আর ক্রোধ। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নতুন করে জেগে ওঠার আশা-আকাঙ্ক্ষা।

দার্জিলিঙ ছিল সিকিমের অঙ্গ। ১৮৩৫ সালে দার্জিলিঙকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ বাঙলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করে। গ্রীষ্মকালীন অবসর যাপনের উপযুক্ত স্থান হিসেবেই ইংরেজরা দার্জিলিঙকে বাঙলাদেশের সঙ্গে বলপূর্বক যোগ করেছিল—এ কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। দার্জিলিঙের ভৌগোলিক অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভুটান, নেপাল আর তিব্বতের দিকে চোখ রেখেই ইংরেজরা দার্জিলিঙকে নিজেদের কবজায় রেখেছিল। দার্জিলিঙের পুরোনো অধিবাসীরা লেপচা। কিন্তু সময়ের স্রোতে তাঁদের সংখ্যা কমে গিয়ে তাঁরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হন। এখন নেপালিরাই দার্জিলিঙের পরিচালিকা শক্তি। আইনের খাতায় তাঁদের পরিচয় নানা বর্গে বিভক্ত। নেপালের সঙ্গে ভারত সরকারের পবিত্র চুক্তির নানা শর্তে তাঁরা আবদ্ধ। কিন্তু সেটা গেল সরকারি ব্যাপার। আইনের ব্যাপার। তা আইনবিদ আর চতুর রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিচারের জন্যই তোলা রইল। সাধারণ মানুষ যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এই মাটিতে বসবাস করছেন তাঁরা কী ভাবছেন, তাই হল চিন্তার বিষয়, বিচারের বিষয়। সেটাই হল বাস্তব। আইন বাস্তবতারই প্রতিফলন। যে আইন বাস্তববিমুখ, সে আইন কালক্রমে জনসমর্থন হারায়। তাই আইনগত প্রশ্ন না তুলে এবং উকিলি তর্ক না করে সমস্যার সামাজিক তথা বাস্তব দিকটি বিচার করা উচিত। এতেই সমস্যা-সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। আমি চাকরির সুবাদে এবং অন্যান্য কারণে বহু দিন দার্জিলিঙ শহরে বাস করেছি। দার্জিলিঙের সাধারণ মানুষের মধ্যে আমি কোনো বিদেশী শাসক বা বিদেশের প্রতি ভালোবাসা লক্ষ করি নি। তাঁরা নিজেদের এদেশের মানুষ বলেই মনে করেন এবং সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধাও দাবি করেন। অবশ্য সমতল আর পাহাড়ি অঞ্চলের মানসিক ব্যবধান লক্ষ করা যায়। সমতলের প্রতি একটা 'বিজাতীয়' ভাব অধিকাংশ মানুষই পোষণ করেন। এটা বাস্তব সত্য।

দার্জিলিঙের সাধারণ মানুষ বহু দিন ইংরেজ সাহেব এবং ইংরেজ চলে যাবার পরে বড়োলোক বাঙালি বাবুদের সেবা করে এসেছেন। ওঁরা সাধারণত চা-বাগানের কুলি-

মজুর, বাড়ির কাজ এবং হোটেলের ফাইফরমাশ খাটবার কাজকর্ম করেই জীবিকা নির্বাহ করেছেন। এক ধরনের দাসত্বও এঁদের মধ্যে ছিল যা আজও পুরোপুরি মুছে যায় নি। এঁদের নানা আচরণের মধ্যে তা লক্ষ করা যায়। কিন্তু ষাটের দশকের পর থেকে এক নতুন প্রজন্মের উদ্ভব হয়েছে। এঁরা পুরোনো প্রজন্মের অনেক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করেছেন। শিক্ষা আর "রাজনীতি" তাঁদের নতুন মর্যাদা-বোধ দান করেছে। স্কুল-কলেজে বেশি-বেশি করে ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা করছে এবং নতুন করে সব ভাবতে শিখছে। রাজনীতির দৌলতে যুবকরা ক্ষমতার স্বাদ আর অর্থ বুঝতে পারছেন। এইসব মিলে তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তুলেছে। কিন্তু সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার বিশেষ সুযোগ তাঁদের কাছে নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা অনেক এগিয়ে এলেও উচ্চশিক্ষার অনগ্রসরতার একটা প্রধান কারণ এঁদের দারিদ্র্য। দারিদ্র্য এবং কিছুটা অনীহার জন্যই এঁরা কলেজের গণ্ডি পার হবার পর, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যত্র পড়াশুনা করতে যান না। কলেজের পড়াশুনা দার্জিলিঙ শহরেই শেষ করা যায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হলে শিলিগুড়ি বা অন্যত্র যেতে হবে। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরই দার্জিলিঙের বাইরে গিয়ে পড়াশুনা করার সংগতি নেই। তা ছাড়া, ডাকতারি বা ইনজিনীয়ারিঙ পড়বার জন্য যে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এঁদের যেতে হয় তাও এঁদের বেশির ভাগ ছেলেমেয়ের পক্ষে কঠিন বলে মনে হয়। এঁদের মধ্য থেকে তাই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আসতে বড়ো একটা দেখা যায় না। দার্জিলিঙ শহরেই যে কয়টি সরকারি আর বেসরকারি কলেজ আছে তার সমস্ত শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে শতকরা ৩ থেকে ৪ ভাগ মাত্র নেপালি শিক্ষক আছেন। এঁদের মধ্যে আবার প্রায় সকলেই নেপালি ভাষা আর সাহিত্যের অধ্যাপক। অন্যান্য বিষয়ে নেপালি শিক্ষক প্রায় নেই বললেই চলে। এ থেকেই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এঁদের অবস্থা বোঝা যায়। অন্যান্য বড়ো-বড়ো চাকরির ক্ষেত্রেও একই চিত্র। অন্যত্রও দুঃখ, দুর্দশা আর বঞ্চনা আছে। অর্থের অভাবে শিক্ষা থেকে বহু মানুষই বঞ্চিত। কিন্তু সমতল বা অন্যত্র এই বঞ্চনা এবং দারিদ্র্য একই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের অসমতার সমস্যা—একই বাঙালি সম্প্রদায়ের দরিদ্র বাঙালি আর ধনী বাঙালির সমস্যা, গোটা সম্প্রদায়ের সমস্যা নয়। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে এটি গোটা সম্প্রদায়ের সমস্যা। তাই এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে আজ যে দাবি উত্থাপিত হচ্ছে তা গোটা সম্প্রদায়কে উদ্বেলিত করতে পেরেছে। ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বলতে গেলেও নেপালিদের বঞ্চনার কথাই বলতে হয়। (চা-শিল্পকে বাদ দিয়ে) এখানকার বড়ো ব্যাবসার মধ্যে হোটেলের ব্যাবসার কথাই উল্লেখ করতে হয়। এইসব হোটেলের মালিক বেশির ভাগই অনেপালি। এঁদের মধ্যে তিব্বতিরাও আছেন। তিব্বতিদের সঙ্গে নেপালিদের আবার অন্য ধরনের তিক্ত সম্পর্ক আছে। ছোটোখাটো ব্যাবসা আর দোকানের মালিকরাও বেশির ভাগই নেপালি নন। পর্যটনশিল্পকে কেন্দ্র করে সাধারণ গরিব মানুষরা হয়তো কিছু বাড়তি রোজগার করেন, কিন্তু পর্যটনব্যাবসা থেকে যে অর্থ উপার্জন হয় তার বেশির ভাগই যায় নেপালিদের হাতের বাইরে। ঠিকাদারির কাজে অবশ্য দু-চার জন নেপালি পয়সা রোজগার করছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার থেকে একটা মোটা অনুদান দেওয়া হয় দার্জিলিঙের ছেলেমেয়েদের আই এ এস/ডব্লু বি সি এস কোরসে বিশেষ শিক্ষা দেবার জন্য। সরকারি কলেজে এই কোরসটা পড়ানো হয়। আমি যতদূর জানি, এখনও পর্যন্ত কোনো আই এ এস এই স্কীমে তৈরি হতে পারে নি। ডব্লু বি সি এস অবশ্য দু-একজন তৈরি হয়েছে। এই কোরসটিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার কোনো আগ্রহ আমার চোখে পড়ে নি। শুধু নিয়মমতন ক্লাস নেওয়া আর অর্থ উপার্জন করাই (পড়ুয়ারাও ভাতা পায়) এর আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে মনে হতে পারে, নেপালি ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক কিছুই করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে সমস্যার মূলে বা গভীরে পৌঁছোনোই যায় নি। ঠাঁট আর জাঁকজমক দিয়ে প্রচারের মাত্রাই বাড়ানো হয়েছে, কাজের কাজ কিছুই হয় নি।

এইসব কারণে বহু দিন ধরে নেপালিদের মধ্যে একটা বঞ্চনাবোধ জমে ছিল বলে আমার ধারণা। অর্থনৈতিক বঞ্চনা দূর না হলে এঁদের অসন্তোষ দূর করা যাবে না। রাজনীতির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। তাঁরা দেখছেন যে সমতলবাসী নেতার কথাতেই পাহাড়ের রাজনীতির 'রাধা'কে নাচতে হয় (যেমন গ্রাম আর শহরের দ্বন্দ্ব)। এটা অনেকদিন একরকম তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে তাঁদের নবজাগ্রত রাজনৈতিক অংশবোধে এটা ততই আঘাত হানছে। বাঙালিরা দীর্ঘদিন ধরে

এঁদের নানাভাবে অবহেলার চোখে দেখেছেন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন। নতুন শিক্ষাদীক্ষার ফলে এইসব চিন্তা তাঁদের অপমানবোধের জন্ম দিয়েছে।

নির্বাচনের সময় দেখা গেছে, দলমতনির্বিশেষে কেউই সাম্প্রদায়িক দিকটিকে অবহেলার চোখে দেখেন না। এতে ভোটের বাক্স স্ফীত হয়। কিন্তু পরিণামে ক্ষতি হয়। নবজাগ্রত তরুণ সম্প্রদায়কে উদার এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সহ কেউ নিতে পারেন নি। কমিউনিস্ট পার্টি আর অন্যান্য দল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে শুধু 'পাইয়ে দেবার' রাজনীতি করে এসেছে। এতেও ভোটের অঙ্কে লাভ হয়েছে। পরিণামে ক্ষতি হয়েছে।

দার্জিলিঙের মানুষ আজ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি করছেন। আজ থেকে অন্তত ১৪-১৫ বছর আগে একজন নেপালি গোরখাপন্থী নেতা আমাকে বলেছিলেন, 'আমরা শেষ পর্যন্ত দাবি করব গোরখাল্যানডের। সময় হলেই করব।' এই দাবির পরিকল্পনা বা ইচ্ছের কথা নিশ্চয় সরকার জানত। কী ব্যবস্থা তারা নিয়েছে জানি না। ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে দার্জিলিঙ সরকারি কলেজে ছাত্র-ভরতির ব্যাপারে গোলযোগ হয়। সে সময় দার্জিলিঙ সরকারি কলেজের শিক্ষকদের ওপর নানা ঝামেলাও হয়েছিল। কলেজ-শিক্ষকদের এক প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। জ্যোতিবাবু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে তাঁর অসহায়তার কথাই জানিয়েছিলেন। পুলিশ অবশ্য তিনি বহু সংখ্যায় পাঠিয়েছিলেন। অবশেষে শিক্ষকরা নিজেরাই নিজেদের মতন করে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করেন। এসব থেকে আমার বার-বার মনে হয়েছে, দার্জিলিঙের সমস্যা হঠাৎ সৃষ্টি হয় নি। অনেক আগেই ছোটো-ছোটো ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নেতারা যতক্ষণ পেরেছেন সমস্যাকে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। এটা তাঁদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা বলব না। বলব তাঁদের রাজনৈতিক অক্ষমতা। সমস্যা সমাধানের অক্ষমতা। জাতি বা উপজাতি সমস্যা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। বরং ভোটের দিকে নজর রেখে তাঁরা নানা অন্যায় কাজ করে গেছেন। বর্তমান "গোরখাল্যানড" আন্দোলন যদি ভুল পথে পরিচালিত কোনো আন্দোলন হয়, তবে সেই ভুল পথ সমতলের নেতাদেরই তৈরি করা।

বর্তমানে যে আন্দোলন দার্জিলিঙে চলছে তা কিন্তু বাঙালি-বিদ্বেষী আন্দোলনে পরিণত হয় নি। বাঙালি-বিদ্বেষী মনোভাব তারা কোথাও দেখায় নি। জেহাদ ঘোষণা করে নি। এটা দার্জিলিঙের বর্তমান আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষণীয় ঘটনা। তবে সমতলের কোনো-কোনো নেতা এই আন্দোলনকে ভোটযুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে অবস্থাকে জটিল করেছেন। সূক্ষ্মভাবে উগ্রবাঙালিপ্রীতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এতে দার্জিলিঙের বাঙালিরা আতঙ্কিত হয়েছেন। নির্বাচনে এর খুব বেশি প্রভাব পড়বে না ভেবেই হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁরা প্রচারের রাশ টেনে ধরেছেন। এটা ভালো।

একটা কথা এখানে তোলা ভালো। আমরা সমতল-বাসীরা কি সত্যিই ভাবতে পারি যে দার্জিলিঙ বাঙলা দেশের অংশ এবং সমস্ত দার্জিলিঙবাসী নেপালি আমার ভাই? ভাবতে পারলে ভালো হত। কিন্তু তা কি আমরা ভাবি? সাধারণ বাঙালি পর্যটকরা যখন দার্জিলিঙ বেড়াতে যান তাঁরা কি সেখানকার মানুষ, তাদের সংস্কৃতি আর আচার-আচরণ দেখে মনে করতে পারেন যে দার্জিলিঙ বাঙলার অংশ? সংবিধান বা আইনে তাই। কিন্তু মানুষের অনুভূতির ওপর তো সংবিধান নয়। যা কিছু সত্য তা সেখানেই ধরা পড়বে। আসলে কেউ কখনও একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করি নি। জাতীয় সংহতি শুধু শ্লোগান।

পুলিশ দিয়ে এই আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না। নির্মূল করার চেষ্টা তো দূরের কথা। শাসক পার্টি রাজনৈতিকভাবে এই আন্দোলনের মোকাবিলা করার কথা বললেও বাস্তবে প্রথম থেকেই তাঁরা গোলাগুলির আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে অবস্থার অবনতি হয়েছে খুব দ্রুত। মৃতদেহ দেখে মানুষ আরও ক্ষুব্ধ হয়েছে। পুলিশ নিরপরাধ মানুষকেও নানাভাবে নাজেহাল করেছে। তাঁদের দ্রুত বিরোধী পক্ষে ঠেলে দিয়েছে। দার্জিলিঙে প্রশাসন প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অথচ দীর্ঘ দিন এই প্রশাসনকে আড়াল করে রাখা হল। আন্দোলনের রাজনৈতিক মোকাবিলা করতে গিয়ে সমস্ত নেপালি সম্প্রদায়কে "জাতীয়তাবিরোধী" আখ্যা দেওয়া হল। সমস্ত সম্প্রদায়ের মনের নাগালের বহু বাইরে শাসক দল নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এল। "রিমোট কনট্রোলে" রাজনৈতিক মোকাবিলা শুরু হল। সমতলের বাঙালিদের স্বদেশী যুগের এবং ১৯৪৭ সালের 'বঙ্গভঙ্গে'র স্মৃতি খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা হল। আলাপ-আলোচনার আসরে যে নেতাদের ক্ষোভ স্তিমিত করা যেত তার পরিবর্তে তাদের আরও উত্তেজিত করা হল।

"স্বায়ত্তশাসন" দার্জিলিঙের সমস্যা-সমাধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই স্বায়ত্তশাসনের দাবিও "জাতীয় সংহতি"র শ্লোগানের মতোই শুধু শাসক দলের রাজনৈতিক প্রস্তাবে কালো অক্ষরের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তাঁরা কখনই করতে চান নি। মাঝে-মাঝে ভোটযুদ্ধে স্বায়ত্তশাসন আর অষ্টম তপশীলে নেপালি ভাষাকে স্বীকৃতি দানের কথা প্রচার করা ছাড়া কিছুই হয় নি। এক দশক আগে স্বায়ত্তশাসন যা সম্ভব করতে পারত আজ তা সহজে পারবে বলে আমার মনে হয় না। তার চেয়েও বেশি কিছু দিয়ে আজ তাদের ক্ষোভকে প্রশমিত করতে হবে। তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে অনেক মূল্যে। সমস্ত রকম সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। সুতরাং আমাদের চিন্তাভাবনাকে বস্তাবন্দী করে না ফেলে মুক্ত করা উচিত। মুক্তমন আর মুক্তচিন্তাই সমস্যা সমাধানে সঠিক পথের নির্দেশ দিতে পারে।

চতুরঙ্গর ফেবরুআরি ১৯৮৭ সংখ্যায় প্রয়াত ব্রজেন্দ্রকুমার দে-লিখিত প্রবন্ধটির ("দাও ফিরে সে অরণ্য") পাদটীকা, লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং পালার তালিকা রচনা করেছিলেন তাঁর পুত্র তরুণ-কুমার দে। সম্প্রতি তিনি যে সংশোধন পাঠিয়েছেন সেটি এই :

"দাও ফিরে সে অরণ্য" প্রবন্ধের পাদটীকায় আমার অসাবধানতাবশত কয়েকটি ভ্রান্তি থেকে গেছে। ১২ নম্বর টীকায় অন্যান্য সকল পালার রচনাকাল ঠিক দিলেও "চণ্ড-মুকুল" পালার অভিনয়কাল ভুল দেওয়া হয়েছে। বস্তুত "চণ্ড-মুকুল" পালার রচনাকাল ছিল ১৯৩৭ সাল। অনুরূপভাবে "দেবতার গ্রাস" পালার রচনাকাল ১৯৪৫ হলেও ওটি ১৯৪৪ সালে রচিত পালার সঙ্গে স্থান দিয়েছে। এ ছাড়া, ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত পালার তালিকা থেকে "নটী বিনোদিনী"র নামটি বাদ পড়ে গেছে। ২১ নম্বর টীকায় "প্রভাস অপেরায় এ পালাটি নাটক নয় নামে অভিনীত হয় নি" বাক্যটির "নি" শব্দটি বাদ পড়ে গেছে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, কপি করার সময়েই এ ত্রুটি হয়েছে। আমি সবিনয়ে চতুরঙ্গের পাঠক-পাঠিকার কাছে সেজন্যে ক্ষমা চাইছি।

তরুণকুমার দে
২৬. ২. ১৯৮৭

বাংলাদেশে মাতৃভাষাচর্চার কথা

বাংলা একাডেমীর ইতিহাস—বশীর আল্‌হেলাল। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬। পৃষ্ঠা পনেরো+৪৫৫। ১৫০ টাকা।

১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বয়স যখন প্রায় ছেচল্লিশ বছর তখন পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলন করেছিলেন 'পরিষৎ-পরিচয়'—সাহিত্য পরিষদের আনুপূর্বিক ইতিহাস নয়, মুদ্রিত তালিকা, বিবরণ এবং লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরিষদের পরিচিতিগ্রন্থ। পরবর্তী কালে এই পরিচিতিগ্রন্থের একটি ঈষৎ পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এবং তারও অনেক পরে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস : প্রথমপর্ব (১৩০০-১৩০১)' নামে যে-ইতিহাস প্রকাশিত হয় তা যথাযথ ইতিহাসও নয়, সার্থক রচনাও নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শতবর্ষপূর্তির আর ছয়-সাত বছর বাকি আছে। আমরা এখনো পরিষদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করে উঠতে পারি নি। অথচ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যে গত নব্বই বছরের উপর বাঙালির ভাষা, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত একথা অস্বীকার করা কঠিন। পরিষদের ইতিহাস সংকলনে অনীহা কি সেই বঙ্কিমচন্দ্র-উক্ত আমাদের ইতিহাসের প্রতি জাতীয় মানস-বৈকল্যের ধ্রুব প্রমাণ, অথবা সাহিত্য পরিষদের সাম্প্রতিক নিষ্প্রভ আয়ুই তার কারণ, সে কথা জানা নেই।

আমরা তিরানব্বই বছরের সাহিত্য পরিষৎ নিয়ে যা করতে পারি নি, পনেরো বছর আগে আবির্ভূত বাংলাদেশ তার একত্রিশ বছরের বাংলা একাডেমী নিয়ে তা করতে চেষ্টা করেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে বাংলা একাডেমীর ইতিহাস সংকলন করেছেন বশীর আল্‌হেলাল।

১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেমবর যে বাংলা একাডেমীর জন্ম হয় তার প্রথম ১৭ বছরের ইতিহাস সংকলন করা হয়েছে এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থের প্রস্থান-বর্ষ ১৯৭২, যখন 'দেশের একটা পর্ব অবসানের পর নতুন ইতিহাসের সূচনা হয়েছে।' তার পরবর্তী ইতিহাস

গ্রন্থসমালোচনা

অবশ্যই অন্য কেউ লিখবেন। বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা মনে করেছেন, 'এত হাতের কাছের ঘটনাগুলোকে নিয়ে এত জলদি নাড়াচাড়া না করাই ভালো।' কারণ 'অপ্রিয়তার তিক্ত স্বাদ সহনীয় উঠতে সময় লাগে।' তবে কতকগুলি প্রসঙ্গ এবং পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট কয়েকটি তথ্যকে ১৯৭২-এর সময়সীমা অতিক্রম করে 'হালনাগাদ' করে দেওয়া হয়েছে, নইলে ধারাবাহিকতার অপূর্ণতা থেকে যেত। 'ভূমিকা'য় বশীর আল-হেলাল বলেছেন, 'ইতিহাস বর্ণনার সাফল্য নির্ভর করে তথ্যপ্রাপ্তিরউপর।... দেখেছি, মানুষের স্মৃতির সঞ্চয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে ইতিহাসের দেহকে ভরাট করে তোলা যায় বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ বিপত্তিরও আশঙ্কা থাকে।' ফলে লেখক 'প্রায় সম্পূর্ণ লিখিত উপাদানের উপর নির্ভর' করেছেন। এ কথাগুলি সূচনায় বিশদ-ভাবে উল্লেখ করার কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সংকলকের যথার্থ ইতিহাস-সচেতন মনোভাবটি স্পষ্ট হয়েছে। ইতিহাস সংকলনে তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই জরুরি শর্ত, কিন্তু যে নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসকে সার্থক করে তোলে তা বর্তমান গ্রন্থে সংকলয়িতা যেভাবে অচঞ্চল রেখেছেন সেইখানেই এই গ্রন্থের যথার্থ গৌরব। তবে মানুষের স্মৃতির সঞ্চয় মুখে বললেই বিপত্তি ঘটানোর আশঙ্কা থাকে, আর সে স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ হলেই ইতিহাসের নিরঙ্কুশ উপাদান হিসেবে গ্রাহ্য হবে, তা বোধ হয় ঠিক নয়। সেখানেও লেখক দুয়েক ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বা বিপর্যয় এড়াতে অন্যতর সূত্র অনুসন্ধান করেছেন—তার দৃষ্টান্ত আছে।

ঢাকার বাংলা একাডেমীর ইতিহাসে স্বভাবতই যাঁর নাম সর্বাগ্রে মনে আসে সেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহের প্রসঙ্গ বারে-বারেই এসেছে। যে তিন-জনের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থ নিবেদিত বাংলা একাডেমীর স্বপ্নদ্রষ্টা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁদের মধ্যে অগ্রোচ্চারিত নাম।

১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগের পর ঢাকাকে কেন্দ্র করে যে নতুন বঙ্গভাষা-সাহিত্য আর সংস্কৃতির আন্দোলন অপরিহার্য হয়ে উঠল এবং যার ফলে বাংলা একাডেমীর জন্ম, মুহম্মদ শহীদুল্লাহই তার প্রধান পুরুষ এবং প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা। একাডেমী প্রতিষ্ঠার পূর্ব প্রক্রিয়া বিবেচনা করতে গিয়ে সংকলক উল্লেখ করেছেন ১৩৩২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্র-সম্মিলনীতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র একটি ভাষণ, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে 'আমাদের চাই The New Oxford Dictionaryর ন্যায় একটি ঐতিহাসিক প্রণালীক্রমে সজ্জিত অভিধান' এবং 'আমাদের প্রাদেশিক বিভাষা সংগ্রহের জন্য আমরা কি বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি করিয়া উদ্যোগী ছাত্র সাহিত্যসেবক পাইব না,' এ ছাড়া, 'দেশের বিভিন্ন স্থানে ভগ্নস্তূপ-রূপে, প্রাচীন মন্দির-মসজিদরূপে বা দীঘি ইত্যাদি প্রাচীন কীর্তিরূপে' যে ইতিহাসের উপাদান ছড়ানো রয়েছে তা সংগ্রহের ভার এবং 'পুঁথি সংগ্রহ ও সন্ধান'-এর জন্য তিনি বহুকাল প্রতীক্ষা করেছেন। তিনি তাঁর জীবন-সায়াহ্নে বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে তার অনেক কাজেই অধিনায়কতা করে গিয়েছেন। যদিও আমাদের জানা আছে যে এসকল কাজের কথা শহী-দুল্লাহ সাহেবই আমাদের কাছে প্রথম বলেন নি। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের অনেক আগে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য পরিষদের প্রসঙ্গেই এ-জাতীয় কথা বারে-বারে বলেছেন। পরিষদের কর্তব্য এবং কর্মক্ষেত্র প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরি-ষদের একাদশ সাংবাৎসরিক কার্য-বিবরণীতে উল্লেখ আছে, 'এই বৎসর পরিষদের জীবনে নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে পরিষৎ বিস্তৃততর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। এতদিন পরিষদের কার্য মুখ্যত ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় আবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি বঙ্গদেশের পুরাতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ভৌগোলিকতত্ত্ব প্রভৃতিও যাহাতে পরিষদের আলোচ্য হয়, তজ্জন্য চেষ্টার আরম্ভ হইয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ পরিষদের কর্মক্ষেত্রের পরিধিবিস্তারের জন্য প্রস্তাব করেন। 'রবীন্দ্রবাবুর অভিপ্রায় যে, অতঃপর বাংলা দেশ ও বাঙালি জাতি সম্বন্ধে যাহা-কিছু জ্ঞাতব্য আছে তাহাই পরিষদের আলোচ্য হউক, যেন পরিষদের কার্যালয়ে আসিলে বাংলা দেশের সম্বন্ধে যে-কোনো জ্ঞাতব্য বিষয়ে সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ বৃহৎ আয়োজন আবশ্যক। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংকলন করিতে হইবে। পরিষদের তদনুরূপ ধনবল ও লোকবল নাই। আপাতত পরিষৎ মফস্বলবাসী ছাত্রগণের সাহায্যে এই অনুসন্ধান ও তথ্যসংকলন কার্যে প্রবৃত্ত হইলে অল্প-ব্যয়ে অধিক ফলের প্রত্যাশা আছে।' রবীন্দ্রনাথের এই আশা এবং পরিকল্প-নাই শহীদুল্লাহ সাহেবের ভাষণে আরও বিশদ কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তবে রবীন্দ্র-নাথের যে আশা-পরিকল্পনা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আজও রূপ গ্রহণ করে নি, শহীদুল্লাহ সাহেবের স্বপ্ন সেক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী অনেকাংশে রূপায়িত করেছে সন্দেহ নেই।

ঢাকায় বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার পিছনে শহীদুল্লাহ সাহেবের ভূমিকা উল্লেখ করতে গিয়ে বশীর আল্‌হেলাল এই পরিকল্পনাপর্বের অপর দিকটিকেও অনুল্লিখিত রাখেন নি। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্যসম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে শহীদুল্লাহ সাহেব উল্লেখ করেন, 'আমরা বাংলার হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান এক মিশ্রিত জাতি, আমাদের ভাষা বাংলাও তেমনি এক মিশ্রিত ভাষা।... ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়। গোঁড়ামি গোঁড়ামিকে জন্ম দেয়। একদল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত-ঘেঁষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর একদল বাংলাকে আরবী পারসী ঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে।' এই ভাষণেই শহীদুল্লাহ সাহেব বলেন, 'আমাদিগে একটি একাডেমী (পরিষদ) গড়তে হবে, যার কর্তব্য হবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ বাংলায় প্রকাশ।' তিনি যদিও 'বিশেষ করে, আরবী, পারসী এবং উর্দু ভাষা থেকে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বইগুলির অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয়' অনুভব করে-ছিলেন, সেই সঙ্গে এও বলেছিলেন যে, 'দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাকে উচ্চ আসন নিতে ও দিতে হবে।' অপর দিকে, মুসলিম লীগ-পোষক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সংবাদপত্র 'আজাদ'-এর সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন ১৯৫২ সালের ২৯ এপ্রিল তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখছেন, 'বাংলা সাহিত্য মুছলমানেরই সৃষ্টি; ইহাতে মুছলমানের একটা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট অবদান আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইহার সত্যকার চিত্র আজও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, এমন কি সে সম্পর্কে বিশেষ কোনো চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।...ইতিপূর্বে পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে যে পরিমাণ মনোনিবেশ করা হইয়াছে, মুছলমানগণ কর্তৃক লিখিত

পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে বা পুঁথি সাহিত্যের প্রতি উহার শতাংশও মনোযোগ দেওয়া বা যত্ন লওয়া হয় নাই। এজন্য হিন্দু সাহিত্যিক ও ইতিহাস-রচয়িতাদের উপর দোষারোপ করিয়া লাভ নাই। দোষ আমাদেরই, একথা স্বীকার করিয়া লইয়া ইহার প্রতিকার করাই আমাদের কর্তব্য।'...'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আমরা সত্বর একটি বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ জানাই।' যে মুসলিম লীগের শাসনকালে উরদুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা এবং উরদু লিপিতে বাংলাভাষা প্রচলনের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল, তাঁদের মুখপাত্রই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করছেন তার পিছনে ছিল সেই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের ভাষা-আন্দোলনে ছাত্রদের মৃত্যুবরণ। তবে মুসলিম লীগের হাতে বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা হয় নি বা যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি থেকে "আজাদ" বাংলা একাডেমীর প্রস্তাব করেছিলেন তাও সফল হয় নি। সূচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা একাডেমী স্থাপন করবেন এমন উদ্‌যোগ গৃহীত হলেও শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ১৯৫৫ সালে আওয়ামী-লীগ-বর্জিত দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ২৬ নভেমবর বাংলা একাডেমী গঠন করেন। এবং এই ঘোষণার সাত দিনের মধ্যে পূর্ববাংলার (তখনো পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান দুই ইউনিট নির্ধারিত হয় নি) মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার ঢাকার বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমীর উদ্বোধন করেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘকাল নানা উপলক্ষে দেশের মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারকে সচেতন করবার চেষ্টা করছিলেন একটি অভূতপূর্ব ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সেই প্রস্তাব মাত্র তিন বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব হল। ভাষা-আন্দোলন কেবল দেশের রাজনীতিকেই নয়, সাংস্কৃতিক জীবনকে কী ভাবে পরিবর্তিত করেছে 'বাংলা একাডেমীর ইতিহাস'-এর পাঠক তা স্পষ্টতই অনুভব করতে পারবেন। ভাষা-আন্দোলন-ভিত্তিক বাঙলাপ্রীতি দেশের মানুষকে এই বাংলা একাডেমীর কাছে সহজেই টেনে নিয়ে এল। তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং আকাশস্পর্শী প্রত্যাশা সম্বল করে বাংলা একাডেমী যেভাবে তার প্রথম সতেরো বছরে পুষ্ট হয়েছে তার তথ্যভিত্তিক বিবরণ দিয়েছেন বশীর আল্‌হেলাল।

বাংলা একাডেমীর প্রথম স্পেশাল অফিসার মুহাম্মদ বরকতউল্লাহ্‌-এর জবানিতে জানা যায় যে সূচনাপর্বে যখন নিয়মাবলী এবং গঠনতন্ত্র রচিত হয় ফ্রেনচ একাডেমির আদর্শে, তখন ভারতবর্ষের সাহিত্য অকাদেমির নিয়মাবলীও সংগৃহীত হয়েছিল ভারতের তদানীন্তন শিক্ষা দপ্তরের হুমায়ুন কবিরের সৌজন্যে। বাংলা একাডেমীর প্রথম কাজ হিসেবে স্থির হয়েছিল, অনুবাদ শাখা সৈয়দ আমীর আলীর "স্পিরিট অব ইসলাম" গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদ করাবেন কয়েকজন প্রধান পণ্ডিতকে দিয়ে। যদিও কার্যকালে এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রন্থটির অনুবাদ হয় নি। বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার এক বছর পরে নিযুক্ত প্রথম পরিচালক মুহম্মদ এনামুল হকের বিবরণ অনুযায়ী গবেষণা বিভাগ, অনুবাদ বিভাগ, সংকলন ও প্রকাশনা বিভাগ এবং সাংস্কৃতিক বিভাগ—এই চারটি বিভাগে একাডেমীর কাজ শুরু হয়। গবেষণা বিভাগে দুই শাখার একটিতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ক্রমবিকাশ শব্দ ও ধ্বনিবিজ্ঞান প্রভৃতি ভাষার ইতিহাস, এবং অপরটিতে পুঁথি পাণ্ডুলিপি লোকগাথা লোকসংগীত পালাগান উপকথা-রূপকথা প্রবাদবাক্য কিংবদন্তী প্রভৃতি সংগৃহীত হবে স্থির হয়। অনুবাদ বিভাগে সংস্কৃতসহ বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষা এবং পাশ্চাত্য ভাষা থেকে ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কীয় গ্রন্থ বাঙলায় অনুবাদ, আবার বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ ইংরেজি এবং উরদুতে অনুবাদের প্রস্তাব হয়। তা ছাড়া, ভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধির জন্য একটি পরিভাষা সংঘও গঠিত হয়। প্রকাশনা বিভাগ দুষ্প্রাপ্য পুঁথি পাণ্ডুলিপি পল্লীগীতির সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বাঙলা অভিধান সংকলন এবং প্রকাশ করবেন স্থির হয়। সাংস্কৃতিক বিভাগ একটি পাঠাগার পরিচালনা করবেন, অপিচ সাহিত্যসভা আলোচনাচক্র পল্লীগানের আসর, কবিগানের আয়োজন করবেন। বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাও করবেন এই বিভাগ স্থির হয়। বাংলা একাডেমীর প্রথম প্রকাশনা ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত বাংলা একাডেমী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা, প্রথম গ্রন্থ মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক আবিষ্কৃত আহমদ শরীফ-সম্পাদিত ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দৌলত উজির বাহ্‌রাম খান রচিত কাব্য "লাইলী

মজুহু।"

বশীর আল্‌হেলাল ২৯২-পৃষ্ঠা-ব্যাপী প্রস্তাবনা, প্রতিষ্ঠার পূর্বপ্রক্রিয়া, প্রাতষ্ঠা থেকে শুরু করে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত আনুপূর্বিক ইতিহাস সংকলনের জন্য সরকারি নথি, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন বা ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতিকথার এক বিপুল সমারোহ ঘটিয়েছেন। কিছু-কিছু চিঠি, সংবাদ বা সরকারি দলিলপত্রের প্রতিলিপিও ব্যবহার করেছেন, যার ফলে গ্রন্থটি একটি অবশ্যসংগৃহীতব্য গুরুত্বপূর্ণ দলিলে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া পরিশিষ্টে সংকলিত The Bengali Academy Act 1952 থেকে শুরু করে একাডেমীর সভাপতি, পরিচালক, মহাপরিচালক, সচিবের তালিকা, বানান সংস্কার সম্বন্ধে একাডেমীর ১৯৬৩ সালে গঠিত একটি উপসংঘের সুপারিশ (যেটি কার্যত অনুসৃত হয় নি, তথাপি ইতিহাসের এক কৌতূহলোদ্দীপক দলিল), একাডেমী-সাহিত্য-পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা এবং একাডেমীর প্রকাশিত গ্রন্থের সূচী সংযোজিত হয়েছে।

বশীর আল্‌হেলাল ইতিহাস সংকলন করতেই উদ্‌যোগী হয়েছেন। একাডেমীর সুপারিশ সিদ্ধান্ত বা কৃতির সমালোচনা এ গ্রন্থের আশু লক্ষ্য নয়। তা তিনি করেনও নি। প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশে রচিত ইতিহাসে তার অংকাশ হয়তো খুব সহজসাধ্য ছিল না। তবে এই ইতিহাসের উপযোগিতা তার জন্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। ভাষাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী কালে যে-কোনো রাষ্ট্রে যে কেন্দ্রীয় সংগঠন স্থাপিত হবে, তাঁদের কাছে বশীর আল্‌হেলালের এই গ্রন্থখানি হয়ে উঠবে এক অপরিহার্য ইতিহাসের শিক্ষাসূত্র। আমরা যেন সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

একালের বাঙলা নাটক

নাট্যসংকলন : দ্বিতীয় খণ্ড—অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা। ডিসেমবর, ১৯৮৫। ষাট টাকা।

একাঙ্ক নাট্যসংকলন : নাট্যসংকলন : তৃতীয় খণ্ড—অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা। নভেমবর, ১৯৮৬। চল্লিশ টাকা।

সাহিত্যশাখা হিসেবে নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার উপস্থাপনামূলক চরিত্র—সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের "দৃশ্যকাব্য" অভিধা থেকে যা সুস্পষ্ট। শুধুমাত্র সাহিত্যগুণসম্পন্ন হওয়া নাটকের পক্ষে তাই যথেষ্ট নয়, তাকে হয়ে উঠতে হয় মঞ্চোপযোগী। বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাটকের এই দ্বৈত দাবি সার্থকভাবে পূর্ণ করতে পেরেছেন এমন নাট্যকারের সংখ্যা নগণ্য। বাঙলা মঞ্চের নাট্যপরিচালকদের একটি চিরন্তন অভিযোগ—বাঙলা ভাষায় প্রযোজনাযোগ্য নাটকের অভাব। মৌলিক নাটক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, বিদেশী নাটকের রূপান্তরে বা বিখ্যাত উপন্যাস আর গল্পের নাট্যরূপ দিয়েও এই সমস্যার বিশেষ কোনো সমাধান করা সম্ভব হয় নি।

বাঙলা সাহিত্যের এই হতাশাব্যঞ্জক পটভূমিতে অজিত গঙ্গোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। তাঁর নাট্যসৃষ্টিগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ এবং মান সম্বন্ধে আলোচনার পরিসর থাকলেও, এদের প্রত্যেকটির বিষয় আর আঙ্গিকে বৈদগ্ধ্যের ছাপ অনস্বীকার্য। বাঙলা মঞ্চের কৃতী পরিচালকেরা তাঁর বহু মৌলিক ও রূপান্তর নাটক সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং সেগুলিকে সফল প্রযোজনার রূপ দিয়েছেন। কোনো বিশেষ নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত না থেকেও অজিত গঙ্গোপাধ্যায় তাই বাঙলা নাটকের অগ্রগতির পথে একটি স্মরণীয় নাম।

নাট্যসংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। এর মধ্যে "অজাযুদ্ধে" সম্পূর্ণ মৌলিক। একটি আদর্শবাদী তরুণীর আত্মহত্যার তদন্তের মাধ্যমে উন্মোচিত হয় আধুনিক পৃথিবীর জটিল জীবনচিত্র—যেখানে বাবা-ছেলে অপরাধ-ব্যবসায়ে পরস্পর প্রতিযোগী, মেয়ে বাবার ব্যবসায়িক ষড়যন্ত্রের শিকার, প্রেম ক্ষমতা এবং অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত। সমকালীন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির কুৎসিত প্রভাবে নাটকের চরিত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত। এই শ্বাসরোধকারী জগতের বিরুদ্ধে, একটি নির্দোষ মেয়ের মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে হেরে যায় দুটি যুবক-যুবতী, পালাতে চায় এই নোংরা পৃথিবী থেকে দূরে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায় তার আগ্রাসী অন্ধ-

কারে। যে কাহিনী শুরু হয় অত্যাচারের মুখোস খুলে দেবার আড়ম্বরে, তাই শেষ হয় পলায়নপর নায়ক-নায়িকার সামাজিক মিলনের লঘুক্রিয়ায়। দৃশ্য এবং অঙ্কের প্রথাঘনুযায়ী বিভাজন নেই এ নাটকে। পণ্যবস্তুর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘটনাসমূহের গ্রন্থনা, ধারালো সংলাপ এবং সময় আর স্থানের নির্বিশেষে ব্যবহার নাট্যকারের বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। নাটকটির স্তরে-স্তরে প্রখর ব্যঙ্গ এবং ক্রোধ অন্তর্লীন হয়ে আছে।

দ্বিতীয় নাটক "সবিনয় নিবেদন" পুরোপুরি মৌলিক নয়। ফরাসি অ্যাবসার্ড নাট্যকার জঁ্য জেনের একাঙ্ক "লে বন" (দ্য মেডস্)-এর মূল ধারণা অবলম্বনে লেখা এই 'আত্মোপাস্ত টুকে মেরে দেওয়া মৌলিক নাটক'। জেনের নাটকের দুই পরিচারিকা বোন, ক্লেয়ার আর সোলঁজ, একে অপরের প্রতিবিম্ব। মনিবানীর অনুপস্থিতিতে ক্লেয়ার সাজে মালকিন্ আর সোলঁজ সাজে ক্লেয়ার। তারপর তারা সাজা-মনিবানীকে হত্যার একটি বিচ্যুয়াল অভিনয় করে। এই অনুষ্ঠান নিয়মিত ঘটে থাকে কিন্তু প্রতিদিনই নাটক চরম মুহূর্তে পৌঁছবার আগেই মালকিন্ এসে হাজির হন। মালকিনকে হত্যা করার সমস্ত চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়, তখন শেষ অভিনয়ে ক্লেয়ারই মনিবানীর ভূমিকায় স্বেচ্ছায় ক্লেয়ার-বেশী সোলঁজ-এর হাত থেকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। ক্লেয়ার-এর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ধ্বংস হয় সোলঁজ এবং অন্য সব চাকরানীদের প্রতিচ্ছবি এবং সেই সঙ্গে মুছে যায় তাদের সুন্দরী বড়োলোক মনিবানীর বিকৃত প্রতিবিম্ব যা বেঁচে ছিল ক্লেয়ারের দাসীসত্তার প্রতিটি স্তরে। এই নাটকে জেনে প্রতীয়মান ও অকৃত্রিম সত্যের মাঝখানের বিভেদরেখাটি তুলে দিয়েছেন। আপাত এবং প্রকৃত বাস্তব যেন একে অপরের প্রতিবিম্ব মাত্র। যেমন ক্লেয়ার প্রতিবিম্ব তার মনিবানীর, আর সোলঁজ ক্লেয়ারের বা ক্লেয়ার সোলঁজের।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর রূপান্তরে জেনে থেকে বেশ খানিকটা সরে এসেছেন। "লে বন" নাটকের পরিচারিকারা এখানে দুই পুরুষ ভৃত্য - গেবলু আর বুদো। তাদের মনিবও পুরুষ। উল্লেখ্য যে ১৯৪৭ সালে ল্যুই জুভে যখন জেনের নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ করেন তখন নাট্যকার মহিলা-চরিত্রগুলিকে পুরুষদের দিয়ে অভিনয় করাতে বলেন। এক্ষেত্রেও হয়তো জেনের বিম্ব-প্রতিবিম্বের ধারণা কাজ করেছিল। কিন্তু "সবিনয় নিবেদন"-এর নাট্যকার কেন পুরুষ-চরিত্র ব্যবহার করলেন সে উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। জেনের নাটকে একটি চমক আছে; মনিবানী ফেরার পূর্ব মুহূর্তে অ্যালারম্ ঘড়িটি না বাজা পর্যন্ত পাঠক বা দর্শক ক্লেয়ার আর সোলঁজ-এর তৈরি মায়াকে সত্য বলে ভাবতে থাকে। আপাত আর প্রকৃত বাস্তবের মধ্যে আদানপ্রদান এই নাটকীয় মোচড়ের মধ্যে দিয়ে জেনে স্পষ্ট করে তোলেন। "সবিনয় নিবেদন" নাটকের শুরুতেই একটি প্রস্তাবনা অংশ আছে যেখানে বুদো সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটা পাঠক-দর্শকের সামনে খুলে ধরে: 'আমাদের বাবুমশাইয়ের উপস্থিতিতে কিংবা অনুপস্থিতিতে / আমরা নিরন্তর চাকরের ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছি—/ কখনো বা বাবুমশাই সেজে, কখনো বা চাকর সেজে,'। ফলে সত্য আর মায়া, প্রতীয়মান আর অকৃত্রিমের মধ্যে যে খেলা, তা নাট্যবস্তুর কেন্দ্র থেকে সরে যায়। অন্যদিকে বুদোর আত্মহত্যাকে শেষ মুহূর্তে থামিয়ে দিয়ে, ভৃত্যদের অভিনীত নাট্যানুষ্ঠানকে তার নৈরাশ্যময় পরিণতি থেকে বঞ্চিত করে নাট্যকার "সবিনয় নিবেদন"-এর ওপর যবনিকা টানেন। এই 'টুকে মেরে দেওয়া' নাটকটিতে বড়ো হয়ে ওঠে মূল নাটকের মনিব-ভৃত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ, যার সরাসরি সমান্তরাল নাট্যকার খুঁজে পান আমাদের দেশের বর্তমান আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থায়—'আমরা জাতেতে চাকর, চরিত্রে চাকর, / কাজেতে চাকর—ভাবেতেও চাকর /…জাতীয় চরিত্রে আমরা যে চাকর'। মূল নাট্য-পরিবেশ, চরিত্রায়ণ ও নাট্য-গঠনে জেনের সম্পূর্ণ অনুসরণ করলেও মুক্তচ্ছন্দে লেখা "সবিনয় নিবেদন" একটি "মৌলিক" সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের অন্য অনেক উপন্যাসের ("চার অধ্যায়" বা "যোগাযোগ") থেকে "ঘরে বাইরে"-র নাট্যরূপ দেওয়া এক অর্থে দুরূহ। এর প্রধান কারণ উপন্যাসটির গঠন। মুখ্য চরিত্রগুলির আত্মকথনকে নাট্য-আঙ্গিকের প্রয়োজনে (বহির্মুখী করে তুলতে গিয়ে) জটিল মনস্তাত্ত্বিক স্তরগুলি হারিয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। বিশেষ করে, নিখিলেশ আর সন্দীপ চরিত্রের অন্তর্নিহিত আদর্শ এবং তার দ্বন্দ্ব যা বিমলার প্রতি ভালোবাসা বা আকর্ষণকে অতিক্রম করে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসকে স্পর্শ করে, তা নাটকের পরিসরে রূপায়িত করা প্রায় অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ নিজস্ব ধরনে যেভাবে ব্যক্তির অনুভব,

উপলব্ধি, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব থেকে অনায়াসে রাজনৈতিক ঘটনা এবং প্রেক্ষাপটে বিচরণ করেন তা সংলাপবহুল এবং নিতান্ত ঘটনানির্ভর নাটকের আঙ্গিকে ধরা দুঃসাধ্য। অজিত গঙ্গোপাধ্যায় প্রখর সচেতনতার সঙ্গে প্রেম আর রাজনীতির দ্বৈত থীমের দ্বিতীয় এই কাহিনীকে নাট্যরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত, যা চরিত্রগুলির চেতনার আয়নায় নতুন আভায় বিকশিত—কখনো আত্মকথন, কখনো স্বগতোক্তি, কখনো একই চরিত্রের দুই সত্তার কথোপকথনের মাধ্যমে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি। অনেক সময় উপন্যাসে বর্ণিত কোনো ব্যঞ্জনাময় পরিবেশ তৈরি করতে গিয়ে তাঁকে দীর্ঘ এবং প্রতীকী মঞ্চনির্দেশ ব্যবহার করতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভাগ্যের পরিহাসে বিধ্বস্ত নিখিলেশের মানসিকতা বোঝাতে যে মঞ্চনির্দেশ ব্যবহৃত হয়েছে তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে: 'বাইরে আকাশে আলো নেই। বিরকম ঘসা কাঁচের মতো চেহারা। ঘরের আকাশও মলিন।'… যাঁরা মঞ্চের প্রয়োজনার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা বুঝবেন মঞ্চের ওপর এই পরিবেশ সৃষ্টি করা বেশ কষ্টসাধ্য। নাট্যরূপটি ঘটনাসন্নিবেশ অনুযায়ী তিনটি অংশে বিভক্ত—অঙ্ক বা দৃশ্যনির্দেশ নেই। প্রথম অংশে বিমলার মনোভূমিতে ঘর আর বাহিরের দোটানার উন্মোচন, দ্বিতীয় অংশে নিখিলেশ-বিমলা-সন্দীপের পারস্পরিক সম্পর্কের বিবর্তন, এবং তৃতীয় তথা প্রধান অংশে রাজনৈতিক ঘটনার ক্রমবর্ধমান জটিলতা এবং বিমলার আত্মোপলব্ধির রূপায়ণ। নাট্যকারের কৃতিত্ব যে তিনি পঙ্গু বা মীরজানের চরিত্রকে অবহেলা করেন নি, কোনো চরিত্রেরই, বিশেষ করে সন্দীপের, কোনো সরলীকৃত রূপ পরিবেশন করার চেষ্টা করেন নি। পুরো উপন্যাসটির শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিনি বর্জন করেছেন—অন্ধকার বারান্দায় নিখিলেশের কাছে অনুতপ্তা বিমলার আত্মসমর্পণ। কিন্তু নাট্যকারের পূর্ণ সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধ সত্ত্বেও উপন্যাসটির উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের বেশি নাট্যরূপটির পরিধিতে ধরা পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথের "সে" রচনাটিকে কোনো নির্দিষ্ট সাহিত্যশাখার অন্তর্ভুক্ত করা শক্ত। এই সৃষ্টির প্রধান সম্পদ একদিকে যেমন কল্পনা অন্যদিকে তেমনি এর গদ্যবলার আশ্চর্য ধরন। নাট্যরূপে "সে"র সেই বিশেষ রচনা-শৈলীটি হারিয়ে যেতে বাধ্য। অজিত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নাট্যরূপের শুরুতেই পুপে ও দাদামশায়ের সম্পর্কের উপস্থাপনায় গল্পের এই আবহাওয়াটি ধরার চেষ্টা করেছেন। সে-র আবির্ভাবের পর থেকে দাদামশায় আর তাঁর গড়ে-তোলা কল্পনার রাজ্যটিকে তিনি সাধারণ্য থেকে আলাদা করেছেন মঞ্চের উপরে একটি ভিন্ন পরিমণ্ডল তৈরি করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে যে স্বচ্ছন্দ বিচরণ সম্ভব হয়, নাট্যরূপে তা ক্ষণে-ক্ষণেই ব্যাহত। নিজস্ব কল্পনার সাহায্যে গল্পের জগতে ঢুকে পড়ার যে আনন্দ পাঠক পেতে পারে তা বিরল হয়ে ওঠে সেই জগৎকে চাক্ষুষ রূপে দেখবার ফলে। হুইউ দ্বীপের বাসিন্দাদের সঙ্গে সে-র মোলাকাত, স্মৃতিরত্নের মনুমেনট-লেহন বা পুকুরের জলে সে-র চেহারা হারানো—এ-সমস্তই লেখার পাতায় আশ্চর্য আর মজাদার—কিন্তু নাট্যরূপে, চরিত্র আর ঘটনার ত্রিমাত্রিক মূর্ততায় মূলের রস থেকে বঞ্চিত। বরং গেছোবাবার অংশটি, যেখানে কল্পনার থেকে নিছক কৌতুকের ওপর নির্ভর বেশি, তুলনায় সার্থক। উল্লেখ্য যে মাত্র দু-একটি ঘটনা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রায় কোনো অংশই বর্জন করেন নি নাট্যকার। উপরন্তু, "ঘরে বাইরে"-র নাট্যরূপে যেমন, এখানেও তেমনি রবীন্দ্রনাথের ভাষাকেই যতদূর সম্ভব ব্যবহার করেছেন তিনি। কিন্তু "সে"র মতো রচনার নাট্যরূপে মূলের রসোপলব্ধির জন্য প্রচলিত নাটকের ধারণা থেকে সরে এসে নতুন কোনো আঙ্গিকের ব্যবহার বোধহয় একান্ত প্রয়োজন। শুনেছি কলকাতারই 'চতুরঙ্গ' নাট্যগোষ্ঠী এই নাট্যরূপটি মঞ্চস্থ করে থাকেন—তাঁদের অভিজ্ঞতা হয়তো এই মূল্যায়নে সাহায্য করতে পারত।

দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ নাটক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গরচনা "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত"-এর নাট্যরূপ। পূর্বোক্ত দুটি নাট্যরূপের তুলনায় এটি সফলতর। বঙ্কিমের রচনার নৈর্ব্যক্তিক সমাজ-সমালোচনা, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, পরিণত রসবোধ নাটকে অক্ষুণ্ণ। ঘটনাসূত্রে দু-একটি বদল ছাড়া নাট্যকার গবেষক ও ইতিহাস নামে দুটি সূত্রধরসদৃশ চরিত্রের সাহায্যে মুচিরাম গুড়ের জীবন এবং পরিমণ্ডল সম্পর্কে বঙ্কিমের মন্তব্য আর ব্যঙ্গোক্তিগুলিকে রূপ দিয়েছেন। এই কাঠামোর প্রয়োগে মুচিরামের জীবন যেন একটি বিশ্লেষণী দূরবীক্ষণে ধরা পড়ে। ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাটকটিতে অনেকগুলি গান ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে

নাট্য-আঙ্গিকে সেইজাতীয় সচলতা এসেছে যা দেশজ লোকনাট্যে বর্তমান।

সংস্কৃত নাট্য-ঐতিহ্যে দশরূপকের মধ্যে 'ভাণ', 'বীথি' বা 'অঙ্ক' জাতীয় কয়েকটি একাঙ্ক নাট্য-আঙ্গিক থাকলেও বাঙলা নাট্যসাহিত্যের একাঙ্ক নাটকের প্রেরণা মূলতপাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ থেকেই পাওয়া। একাঙ্ক নাটককে ছোটোগল্পের নাটকীয় সমতুল বলা যেতে পারে। সাধারণত একাঙ্কের নাট্যবস্তু একটিমাত্র ঘটনা বা পরিস্থিতির চারপাশে কেন্দ্রীভূত—জীবনের পরিপূর্ণ চেহারা নয়, তার একটি বিশেষ রূপ ধরা পড়ে একাঙ্ক নাটকের পরিধিতে। চরিত্র-সংখ্যার স্বল্পতা এবং স্থান আর কালের ঐক্য এই নাট্যশাখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাঙলা ভাষায় একাঙ্ক নাটক বড়ো কম লেখা হয় নি। তবে একাঙ্ক নাটকের অভিনয় হালের ঘটনা। গ্রুপ থিয়েটারগুলির উত্থান আর বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙলা মঞ্চে একাঙ্ক নাটকের চাহিদা বেড়েছে। ইদানীং বহু নাট্যগোষ্ঠী নিয়মিত একাঙ্ক নাটক প্রযোজনা করেন। এছাড়া একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা স্কুল, কলেজ এবং অন্যত্রও প্রায়শ অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা নাট্যজগতে একাঙ্ক নাটকের ভূমিকা পূর্ণাঙ্গ নাটকের থেকে কম জরুরি নয়।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্য-সংকলনের তৃতীয় খণ্ডটি তাঁর বারোটি একাঙ্ক নাটকের একটি সংগ্রহ। এর মধ্যে তিনটি রূপান্তর নাটক—দুটি শেখভ ও অন্যটি গল্‌স্‌ওয়ার্দি অনুসরণে। শেখভের "দ্য অ্যানিভারসারি" অনুসরণে "সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে" খানিকটা প্রহসন-জাতীয়। মূল নাটকের ঘটনা, চরিত্র বা সংলাপের তেমন কোনো পরিবর্তন না করে পরিবেশটিকে শুধু বদলে দিয়েছেন নাট্যকার। এই রূপান্তর যে সফল তার প্রধান প্রমাণ শেখভের কৌতুকবোধ আর হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা কোথাও এতটুকু নষ্ট হয় নি। নাটকটি "বহুরূপী" নাট্যসংস্থার প্রথম যুগের প্রযোজনার একটি। "দ্য বেয়ার" অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের কলমে রূপ নিয়েছে "বর্বর"-এ। আপাতদৃষ্টিতে হাসির নাটক মনে হলেও এর মধ্যে একটা আশ্চর্য গভীরতা আছে। পুরুষ-নারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি থেকেই তা উৎসারিত। শেখভের মূল নাটকের হাসি আর গাম্ভীর্যের ভারসাম্য রূপান্তরে খানিকটা লুপ্ত। হাসির দিকেই পাল্লাটা ভারি হয়েছে—বিশেষ করে হলধর হালদারের মুখে সাধুভাষার সংলাপ ব্যবহারে। রুশ পরিবেশকে বাঙালি করে তুলতেও নাট্যকারকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে—বিশেষত খামারবাড়ি, ঘোড়া, আস্তাবল ইত্যাদি বাঙলার গ্রামসমাজে একেবারেই অপরিচিত। গল্‌স্‌ওয়ার্দি-অনুপ্রাণিত "সামান্য সেই লোকটি" মানবিক আবেদনে ধনী। একজন সাধারণ লোক, অথচ অসাধারণ, কারণ মানুষের যা যা হওয়া উচিত তিনি তাই, বহু স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানুষের ভিড়ে নিগৃহীত হতে-হতে অবশেষে সাধুসন্তের স্তরে উন্নীত হন পরিবেশের চাপে—এই কাহিনী নিয়ে নাটক। রূপান্তরের গুণে এ নাটকের চরিত্র, ঘটনা বা পটভূমি কোনোটিকেই বিদেশী বলে মনে হয় না। মূল নাটকের কৌতুক-দৃষ্টি, (থাকে হিউমার বললে আরও স্পষ্ট হয়) সামাজিক ব্যঙ্গ এবং মানবিক গুরুত্ব—সবই রূপান্তরে উপস্থিত।

মৌলিক "নবদূর্বাদলশ্যাম" আদ্যোপান্ত নিছক হাসির নাটক। এক অতিথিবৎসল অথচ কলহপরায়ণ দম্পতির নিমন্ত্রণরক্ষা করতে গিয়ে যে বিচিত্র পরিস্থিতিতে পড়েন একজন ছাপোষা ভদ্রলোক, তাকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এই নাট্যকাহিনী। এই লঘু চালের নাটকটি উৎপল দত্তের "এল. টি. জি" গোষ্ঠী প্রযোজনা করেছিলেন ষাটের দশকে।

একাঙ্ক-সংকলনের অন্য আটটি নাটককে বিষয়ানুযায়ী দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। "নাট্যকারের বিপত্তি", "নব স্বয়ংবর", "প্রমত্ত প্রহসন" এবং "বিষণ্ণ প্রহসন"-এর বিষয় সাধারণভাবে নাটক এবং তৎসংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা, প্রশ্ন এবং তত্ত্ব। "নাট্যকারের বিপত্তি"র নায়ক স্বয়ং নাট্যকার। যে সং সিরিয়াস নাটক কেউ পড়ে না, ছাপে না বা দেখে না, তা লিখতে গিয়ে আর্থিক এবং পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত লেখক শেষ পর্যন্ত নাটক লেখা ছেড়ে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু মুশকিল হয় তাঁর নাটকের চরিত্রদের নিয়ে। তারা সশরীরে আবির্ভূত হয়ে বেঁচে থাকার দাবি জানায়। ব্যবসায়ী নাট্যকার আর প্রযোজক, যারা নাটক বেচে খায়, তাদের হাতে পড়ে বিকৃত হতে চায় না চরিত্রগুলি। এদের অবহেলা করতে পারেন না নাট্যকার—নতুন করে আবার নাটক লেখার কথা ভাবেন। হাসির মোড়কে সমকালীন নাট্যজগতের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিকে সমালোচনা করা হয়েছে এই নাটকে। যতদূর জানি, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের এই নাটকটিও "বহুরূপী" নাট্যগোষ্ঠী মঞ্চস্থ করেছিলেন। মঞ্চযোগ্য নাটকের অভাবের সমস্যা দিয়েই "নব-স্বয়ংবর"-এর সূত্রপাত হলেও প্রস্তাবনার পর গড়ে ওঠে অন্য এক নাটক। এক অত্যাধুনিক যুবক, এক মার্কসিস্ট, এক প্রৌঢ় বুদ্ধিজীবী, এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক, একজন ধনী ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এক মাতাল আর একজন নিতান্ত বৈশিষ্ট্যহীন ভদ্রলোক—এই বিচিত্র প্রার্থী-সমাবেশ থেকে নায়িকা বেছে নেয় সবচেয়ে সাধারণ মানুষটিকে, ভালোভাবে বাঁচা ছাড়া যার অন্য কোনো উচ্চাশা নেই। হালকা সুরের নাটক হলেও "নব-স্বয়ংবর"-এর একটি স্পষ্ট জীবনদর্শন আছে। একাঙ্কটি এক সময় 'নান্দীকার' গোষ্ঠীর প্রযোজনার অন্তর্গত ছিল। "বিষণ্ণ প্রহসন" নাটকটির পাত্র-পাত্রী অভিনেতা-অভিনেত্রী। নাটক শুরু হবার মুহূর্ত আসন্ন, কতিপয় দর্শক প্রেক্ষাগৃহে আসীন, কিন্তু অভিনেতাদের কোনো অভিনয় করার মতো নাটক নেই। পরিচালক অদৃশ্য থেকে সমস্তটাই এঁদের উদ্ভাবনীশক্তির ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু মঞ্চের ওপর নাটক তৈরি করতে গিয়ে এঁরা নিজেদের জীবনের যন্ত্রণার অন্ধকারকে বারবার তুলে ধরেন। এঁদের মধ্যে সব দিক থেকে ব্যর্থ অভিনেতাটি তাঁর নৈরাশ্যের ভার বহন করতে না পেরে চিরদিনের জন্য মঞ্চ এবং অভিনয়জীবন ত্যাগ করে চলে যান। এই ঘটনার পরে বাকি নাটক চলতে গিয়েও থেমে যায়—যেন ওই মুহূর্তই এ নাটকের চরম ট্রাজিক মুহূর্ত। নাট্যজগতের সঙ্গে জড়িত নাট্যকর্মীদের হতাশা, ক্লান্তি আর যন্ত্রণার কথা বার-বার ফিরে আসে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্যসৃষ্টিতে। "বিষণ্ণ প্রহসন" আঙ্গিকে প্রহসন নয়, পাত্র-পাত্রীদের জীবন-প্রহসনের নাট্যচিত্র। আগের তিনটি একাঙ্কের থেকে "প্রমত্ত-প্রহসন" অন্য জাতের নাটক। চিরন্তন কিছু ট্রাজিক আর কমিক অভিনেতাদের নিয়ে গড়ে ওঠে এর নাট্যঘটনা। একই মঞ্চে, একই দৃশ্যপট ব্যবহার করে তারা তাদের ভিন্ন আঙ্গিকের নাটক অভিনয় করবে। প্রথমে শুরু হয় কমেডির অভিনয় কিন্তু মাঝপথে নাট্যাচার্যের নির্দেশে ট্রাজিক অভিনেতারা ঢুকে পড়ে এবং তাদের নাট্যাভিনয় শুরু হয়। সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে দুই ট্রাজিক অভিনেতা, অকটোভিয়াস নীলাদ্রি এবং পন্‌টিয়াস অরুণাংশু, পরস্পরকে হত্যা করে। নাট্যমায়া কঠোর বাস্তবে পরিণত হয়। এই বিয়োগান্ত নাটকের মঞ্চেই, দুই বন্ধুর মৃতদেহের ওপর শুরু হয় কমেডির অভিনয়। প্রহসনের বাহ্যিক উপাদান আর পোশাক থাকলেও এই একাঙ্কটির বিষয় অত্যন্ত গভীর। জীবন আর নাটকের, হাসি আর কান্নার, সত্য এবং মায়ার বিভেদরেখা কোথায়, বা আদৌ তার কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা—এইসব মৌল দার্শনিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ায় এই নাটক।

সংকলনের বাকি চারটি একাঙ্ককে রাজনৈতিক নাটক বলা যেতে পারে। রাজনৈতিক সচেতনতাই এদের সামান্য বৈশিষ্ট্য। "আজকের উত্তর" কারখানার একজন ধর্মঘটী শ্রমিকের স্বপ্নের ফ্রেমে সত্যের স্বরূপ বিষয়ে অতীত আর বর্তমানের কথোপকথন। অতীতের চরিত্রদের মধ্যে আছেন নচিকেতা, দধীচি এবং চার্বাক; এ ছাড়া ঘৃতসেন-নামক এক ব্যবসায়ী আর তার কর্মচারী অধমদাস; অন্যদিকে বর্তমানের প্রতিনিধি ঝানু ব্যবসায়ী শেঠ ঝুনঝুনদাস এবং ফণিভূষণ আর বৈদ্যনাথ নামে তারই কারখানার দুই সংগ্রামী শ্রমিক। সূত্রধরের ভূমিকায় এক নিরাবয়ব কণ্ঠস্বর অতীত আর ভবিষ্যতের যোগসূত্র সৃষ্টি করে। মৃত্যুর বিরুদ্ধে নচিকেতার সংগ্রাম, দধীচির আত্মত্যাগ বা চার্বাকের দর্শন সাধারণ মানুষের কোনো দাবি শেষ পর্যন্ত মেটাতে পারে না। ব্যবসায়ী ঘৃতসেন তার কর্মচারীকে যথেচ্ছ শোষণ করে যায়। আজকের ফণিভূষণ তাই অতীতের তিন মহাপুরুষকে বলে, "পরম সত্য বলে তো কোনদিন কিছু ছিলো না। ওটাকে জানবার শেষে বসিয়ে রাখা হতো—না জানার আরম্ভতে। পরে কারবারী লোকেরা ওটাকে আপনাদের মতো বোকা ঘোড়ার চোখে ঠুলি হিসেবে লাগিয়ে রেখেছিলো।" অধমদাস নিজে রুখে দাঁড়ায় বলেই ঘৃতসেন তার পাওনা কিছুটা মেটাবে কিনা ভাবে, অন্যদিকে বর্তমানের ঝুনঝুনদাস ধর্মঘট মিটিয়ে ফেলার জন্য ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত শ্রমিকদের সমস্ত দাবি মেনে নেয়। যে সংগ্রাম, যে সন্ধান একার, বহুর জন্য নয়, তা শেষ পর্যন্ত অসত্য, ব্যর্থ। ব্যঙ্গকৌতুক আর হালকা হাসির মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয় এই বাস্তব, জরুরি সত্য। "একটি যুদ্ধের ইতিহাস" নাটকটিতেও অতীত এবং বর্তমানকে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। প্রস্তাবক কণ্ঠস্বর বর্ণিত দুর্যোধন ও ভীমের গদাযুদ্ধের পটভূমিতে অভিনীত হয় আধুনিক একটি যুদ্ধ যার পদ্ধতি মহাকাব্যের সেই যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি জটিল। সমকালীন জীবনের অন্যায় যুদ্ধে পাবক্ষম অসীম অনায়াসে আদর্শবাদী, সৎ অনন্তকে হারিয়ে দেয়, কিন্তু পরি-

পতিতে সাধারণ মানুষের দল এসে দাঁড়ায় অনন্তের পাশে, আর সেই মানুষের মিছিলে পরাভূত, বিলুপ্ত হয়ে যায় কূটযোদ্ধা অসীম। পুর্বোক্ত দুটি নাটকের মতো "এই সব স্বগতোক্তি" একাঙ্কটিতেও পুরাণ ও পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। পুরাণ ব্যবহারে নাট্যকার বারংবার বর্তমানকে যুক্ত করেন অতীতের সঙ্গে—এই প্রবণতার মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর ঐতিহ্যচেতনা আর ইতিহাস-সচেতনতা। "এই সব স্বগতোক্তি"কে কাব্যনাটক বলা যায়—পাঁচজন পুরুষ আর একটি নারীর বিচ্ছিন্ন কাব্যময় স্বগতোক্তি যুক্ত হয় পৌরাণিক সূত্রে—অতীত বর্তমানের সমান্তরাল অত্যাচার, যন্ত্রণা আর শোষণের ইতিহাসে। এ নাটকের নায়ক কোনো বিখ্যাত পৌরাণিক চরিত্র নয়, মহাভারতের সংশপ্তক সেনানী যারা হীনজন্ম হলেও সংগ্রামী বীরত্বে সামান্য নয়, জীবন পণ করে যারা যুদ্ধে নেমেছে। মহাকাব্যের পঞ্চ নায়ক, ইতিহাসের মহান নায়কদের নিষ্প্রভ করে তারা দশ দিক থেকে মঞ্চক্ষেত্র ছেয়ে ফেলে, নিজেদের মধ্যে টেনে নেয় নায়কদের অবিচারের শিকার নারীটিকে, তারপর বহুদিনের অত্যাচারের কথা বলতে-বলতে, পৃথিবীর অন্যান্য অত্যাচারিতদের সঙ্গে মিলে তারা এগিয়ে যায় তাদের প্রাপ্য জয়ের দিকে, জীবনের দিকে, সূর্যের দিকে। দেশ-কালব্যাপী গণ-আন্দোলনের বিপুল প্রবাহ বয়ে যায় ইতিহাসের মঞ্চ জুড়ে। নাটকটির সংলাপে অসাধারণ কিছু কবিতা স্থান পেয়েছে যা পড়ে মনে হয় শুধু নাট্যকার নন, অজিত গঙ্গোপাধ্যায় সার্থক কবিও বটে। "সূর্যের মতো সমুদ্র" একাঙ্কটি নাটকীয় মনতাজের ধরনে লেখা। শেখাদ্রি এবং মিছিল—এই দুই চরিত্রের দুই জগৎ—পচন-ধরা অর্ধমৃত বনেদি সমাজ আর জীবন্ত, সুস্থ, খেটে-খাওয়া মানুষের পৃথিবী। শেখাদ্রি তার নীলচে আলোর ব্যক্তিগত বৃত্তে একা, মিছিল এবং তার সৌর আলোয় ভরা জনসমুদ্রকে সে ঘৃণা করে অথচ নিজের ব্যাধিগ্রস্ত পরিমণ্ডলকেও পুরোপুরি ভালোবাসতে পারে না। তার বোন এই পরিবেশ থেকে বাঁচতে গিয়ে আত্মহত্যা করে, তার স্ত্রী আর মেয়ে তাকে ছেড়ে যায়, তবু শেখাদ্রি তার নিষ্প্রাণ একাকিত্ব আঁকড়ে মৃত স্মৃতির জগতে বেঁচে থাকে। মিছিল তাকে ডাকে, অজস্র মানুষের ফেনায়িত জীবন তাকে আকর্ষণ করে, আর শেখাদ্রি ক্রমশ সরে আসতে থাকে নীল আলোর ঘেরাটোপের বাইরে, অবশেষে মিশে যায় সূর্যের মতো প্রাণবন্ত মানুষের সমদ্রে। এ নাটকে নাট্যকারের পরিণত রাজনৈতিক তথা ঐতিহাসিক চেতনার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে—মঞ্চযোগ্যতার দিক থেকেও এই একাঙ্কটি এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ নাটক বলে মনে হয়।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটকগুলি বাঙলা ভাষায় নাট্যরচনার একটি বিশেষ যুগের প্রতিনিধি। যে যুগে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও নাটক লেখা ছিল এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, যে যুগে মঞ্চস্থ বা প্রকাশিত হোক না হোক, নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল একটা জীবন্ত অঙ্গীকার, যে যুগে সৎ নাট্যরচনাই ছিল নাট্যকারের প্রধান সার্থকতা—সেই যুগের ফসল অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটক। তাঁর প্রতিটি নাট্যসৃষ্টিই যে সাহিত্যিক মূল্যায়নে মঞ্চোপযোগিতার বিচারে উত্তীর্ণ, তেমন বললে অত্যুক্তি হতে পারে, কিন্তু একথা সত্য যে তাঁর প্রতিটি নাটকের বিষয়, সংলাপ এবং আঙ্গিক রচনায় তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় বর্তমান। বাঙলা নাটকের জগতে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়ে, নিজের জীবন-বীক্ষা আর বিশ্বাসকে সংভাবে রূপায়িত করে অজিত গঙ্গোপাধ্যায় বাঙলা নাটকের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি নাটক-পাগল মানুষকে ঋণী করে গেছেন।

শেষ কবার আগে মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। নাট্য-সংকলনের এই দুটি খণ্ডের প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা, হরফ-বাছাই, কাগজ, বাঁধাই—সবই উচ্চমানের এবং প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু দুটি খণ্ডেই অসংখ্য মুদ্রণপ্রমাদের ফলে প্রকাশনার অন্যান্য দিক ম্লান হয়ে গেছে। দু-এক পাতা অন্তর একটি করে ছাপার ভুল চোখে পড়ে। কোথাও 'আস্তন শেখন' হয়েছে 'আনন্ত শেখন', কোথাও 'কণ্ঠস্বর' হয়েছে 'কট্টস্বর', কিংবা 'অন্তরতম' হয়েছে 'অন্তরম' বা 'বিয়াফ্রা' হয়েছে 'বিয়াত্রা', 'Guinter Grass' হয়েছে giinter grarss'। এই ধরনের অবহেলার ফলে "অজাযুদ্ধে" নাটকে একটি চরিত্র 'শাতু' থেকে 'সন্ত'তে পরিবর্তিত হয়েছে।

"নব-স্বয়ংবর"-এর চরিত্রলিপিটি ছাপা হয়নি। 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে' আর "নবদূর্বাদলশ্যাম" কোন্ নাট্যগোষ্ঠী অভিনয় করেছেন তা উল্লিখিত হলেও, "সে", "নাট্যকারের বিপত্তি" বা "নব-স্বয়ংবর"-এর প্রযোজনা সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই। ভবিষ্যতে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যান্য নাটকগুলি (শকুন্তলা রায়', 'থানা থেকে আসছি', 'আকাশ-বিহঙ্গী' 'নির্বোধ' ইত্যাদি) নিয়ে প্রকাশক এই সংকলনের আরও কয়েকটি খণ্ড হয়তো প্রকাশ করবেন। সেই খণ্ডগুলির মুদ্রণে তাঁরা নিশ্চয় আরও বেশি যত্নশীল হবেন। বাঙলা ভাষায় নাটক প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটা সার্বিক অবহেলা দেখা যায়। আলোচ্য প্রকাশন সংস্থা সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করবেন এবং অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে বাঙলা নাট্যসাহিত্যকে নাট্যানুরাগীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবেন—এমন আশা করা বোধহয় অন্যায় হবে না।

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলা নাটকের অতীত-বর্তমান

বাংলা থিয়েটার—কিরণময় রাহা। গ্রীন পার্ক, নতুন দিল্লী। পনেরো টাকা পঁচিশ পয়সা।

বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৩। পঁয়তাল্লিশ টাকা।

১৬১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একটি সুমুদ্রিত বই; সেইসঙ্গে বেশ-কিছু সুমুদ্রিত আর্ট প্লেট। আর পুরনো আর বর্তমান কলকাতার নাট্যশালার অবস্থান-নির্দেশক মানচিত্র: এই নিয়ে 'বাংলা থিয়েটার' পাঠককে বাঙলার রঙ্গালয়-জগতে প্রবেশাধিকার দেয়। মূলত ইংরেজিতে লেখা। অনুবাদ করেছেন শ্রীকুমার রায়, সেই সঙ্গে দিয়েছেন বাঙলা ভাষায় মূল উদ্ধৃতি। সত্যের খাতিরে স্বীকার্য, এখানি বড়ো উপাদেয় বই।

এটি লেখার পেছনে লেখকের নিরলস গবেষণা এবং পরিশ্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু শ্রমের স্বেদবিন্দুটুকু তিনি মুছে নিয়েছেন, উপহার দিয়েছেন সম্পূর্ণ ইতিহাস। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে বাঙলা থিয়েটারের দান অবশ্যস্বীকার্য (পরিচয়লিপিতে লেখা হয়েছে "অবদান"। এ শব্দটি কি জরুরি ছিল?)। সেই দানের ইতিহাস—পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন ঝরঝরে ভঙ্গিতে লেখা। সূচিপত্রে পনেরোটি পরিচ্ছেদের বিন্যাসেই ধরা পড়ে লেখকের ইতিহাসবোধ, রসবোধ এবং বিচারশক্তি। কোন্‌টা কতটুকু বলতে হবে, আর কোন্‌টা বাদ দিতে হবে, তার পরিচয় এখানে আছে। মনে পড়ছে, মঞ্চানুরাগী বিজ্ঞানী চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের কথা। তিনি 'সূত্রধার'-ছদ্মনামে লিখেছিলেন একটি পুস্তিকা—"অথ নটঘটিত"। হালকা চালে সরস ভঙ্গিতে তিনি বাঙলা থিয়েটরের দেড়শ বছরের ইতিহাস পরিবেশন করে ছিলেন বিশ বছর পূর্বে। সে বই আজ দুর্লভ। এত দিন বাদে পেলাম কিরণময় রাহার বইখানি। এ বইয়ের অতিরিক্ত গুণ, এর ডকুমেনট-সুলভ চরিত্র, সেই সঙ্গে গভীর রসবোধ।

বাঙলা থিয়েটরের ইতিহাস সম্ভবত প্রথম লেখেন হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বইয়ের নাম "The Indian Stage"। বইটি আগাগোড়া উচ্ছ্বাসে ভরা, তথ্যে আছে বিস্তর ভুল আর ফাঁকি, রসবোধেও ঘাটতি আছে। একটু নমুনা দিই। শেকসপীয়রের সঙ্গে গিরিশ ঘোষের আর তাঁর নাটকের চরিত্রগুলির শেকসপীয়রের সঙ্গে তুলনা করে দাশগুপ্ত অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। যেমন, মহাভারতের নির্ভীক জনা-কে (গিরিশ ঘোষের 'জনা' নাটক) দাশগুপ্ত মনে করেন—'more majestic than even Shakespeare's Volumina and more determined and dignified than Queen Margaret। ('The Indian Stage', p. 127)। "জনা" নাটক পড়লেই আমরা এর দুর্বলতা অনুধাবন করতে পারি।

শ্রীযুক্ত রাহা সংগত কারণেই নাট্যকার-অভিনেতা-ম্যানেজার-পরিচালক গিরিশ ঘোষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। তাঁর কথায়, 'গিরিশ ঘোষকে তিনি (প্রতাপ জহুরী) চাকরি ছেড়ে দিতে প্ররোচিত করেন এবং বেতনভোগী ম্যানেজার হিসেবে থিয়েটারের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানান। গিরিশ ঘোষ যে স্বাম্বী চাকুরী ছেড়ে কম বেতনে এমন ক্ষেত্রে একটা দুঃসাহসিক ঝুঁকি নেন যার ভবিষ্যত অনিশ্চিত, এতেই বোঝা যায় যে গিরিশ ঘোষ, অন্য কোন বৃত্তিতে থাকলেও থিয়েটারের উন্নতির জন্য তাঁর সময়, উৎসাহ ব্যয় করতে দ্বিধা করতেন না এবং করেছিলেনও তাই ১৯১২ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত।'

শ্রীরাহা গিরিশ-ব্যক্তিত্ব আলোচনা করে লিখেছেন, 'তিনি কতক দিক থেকে একটু জটিল, ভাবপ্রবণ ব্যক্তি, একজন আদর্শবাদী এবং বাস্তববাদীও, একটু বা খেয়ালী প্রকৃতির কিন্তু

তথাপি প্রচণ্ড অধ্যবসায়ী ছিলেন। (অবশ্য তিনি যা বিশ্বাস করতেন তার বিপরীত কাজও করতেন)। অন্য সময়ে তিনি বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে যে-মঞ্চকে তিনি ভালবাসতেন, তার কল্যাণে তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থও ত্যাগ করতেন।'

শ্রীরাহা গিরিশ ঘোষ সম্পর্কে এত কথা বলেছেন। আফসোস এই যে এখানেই থেমে গেছেন। বাঙলা থিয়েটরে সদর্থে প্রযোজক (প্রোডিউসর) কাকে কাকে বলা যায়? এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর তিনি দেন নি। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ('সুত্রধার') স্পষ্ট করে লিখেছিলেন—বাঙলা থিয়েটরে প্রথম প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় প্রযোজক শিশিরকুমার, তৃতীয় প্রযোজক শ্রীশম্ভু মিত্র। তিনি গিরিশ ঘোষকে প্রযোজক বলতে রাজি নন। এই বিষয়ে শ্রীরাহার সুস্পষ্ট মতামত পেলে ভালো হত।

শ্রীরাহার আরেকটি গুণ নাটকের মঞ্চ-উপস্থাপনা-প্রসঙ্গে তার সাহিত্য-মূল্যেরও বিচার। বাঙলা ব্যবসায়ী মঞ্চ কেন রবীন্দ্র-নাটক নিল না, এ বিষয়ে তাঁর বিচার স্বচ্ছ, যুক্তিনিষ্ঠ। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ তার পরিচায়ক। কয়েকটি রবীন্দ্র-নাটক রবীন্দ্রনাথকে পেশাদার থিয়েটরের কাছাকাছি এনেছিল, কয়েকটি ঠেলে দিয়েছিল দূরে। তার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। যে-নাটক ("রাজা ও রানী", ১৮৯০) ত্রুটিপূর্ণ মনে করে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নতুন রূপ দিয়েছিলেন সেই নাটক মঞ্চসফল হয়েছিল, অথচ পরিমার্জিত রূপটি ("তপতী", ১৯২৯) শিশির ভাদুড়ীর প্রযোজনাতেও ব্যর্থ হয়েছিল, এ এক লক্ষ করার মতো ঘটনা বলে শ্রীরাহা মনে করেন। এ বিষয়ে তাঁর মতামত (পৃ ১১১) যুক্তিসংগত। শ্রীশম্ভু মিত্র সেই রবীন্দ্র-নাটক ("রাজা") মঞ্চস্থ করে সাফল্য পান যাকে ব্যবসায়ী থিয়েটরওয়ালারা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। এড়িয়ে-যাওয়া আর গ্রহণ করার কারণ কী? এ বিষয়েও শ্রীরাহা তাঁর মতামত দিয়েছেন (পৃ ১১১-১১২) এবং বিচার করেছেন "রক্তকরবী" নাটকের মঞ্চসফল প্রযোজনার কারণ। শ্রীশম্ভু মিত্র ও শ্রীবাদল সরকারের প্রযোজনার যে বিচার (পৃ ১৪৩-১৫০) তিনি করেছেন তাতেও তাঁর পক্ষপাতহীন গভীর বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাই।

দেড় শ বছরের বাঙলা থিয়েটরের চিত্তাকর্ষী ইতিহাসকে ১৬১ পৃষ্ঠার মধ্যে উপস্থিত করার যে নৈপুণ্য শ্রীরাহা দেখিয়েছেন তা তারিফ পাবার যোগ্য। তারিফ আরো এই কারণে যে, এটা টানা ঘটনা-বিবরণ নয়, এতে আছে বিশ্লেষণ আর বিচার। অনুবাদ স্বরস্বরে। অনুবাদক শ্রীকুমার রায়কে তাঁর প্রাপ্যটুকু দিতেই হবে। তাঁর কাছে একটি নিবেদন—'একত্রিত' (পৃ ৫৪) লেখেন কেন, 'একত্র' লিখলেই যথেষ্ট।

এই বইয়ের অনুবাদ হওয়া উচিত আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে। প্রকাশক সংস্থা একটা ভালো কাজ করেছেন, তা অকপটে স্বীকার করি।

"গু অকসফোর্ড কমপানিয়ন টু গু থিয়েটর" গ্রন্থে প্রখ্যাত ব্রিটিশ অভিনেতা হেনরি আরভিং সম্বন্ধে লেখা হয়েছে:

> The tall figure, the beautiful, intense, ascetic face singled by nature for tragedy—now embodying a noble pride, now malignant horror, now sardonic impudence, now grotesque at that point where it turns grim—threw a spell over his audience.

এই বিবরণ থেকে আরভিং-এর অভিনয়সামর্থ্যের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। অ্যাডিলানটিকের এপারে ওপারে প্রকাশিত অনেক বই পাওয়া যায়, যাতে অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক এবং থিয়েটর-ম্যানেজারবৃন্দ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের মূল্যবান স্মৃতিকথা। তা থেকে অনায়াসেই গড়ে তোলা যায় শতাব্দের অভিনয়ের ইতিহাস—পাওয়া যায় তার বৈচিত্র্য আর বিকাশের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এ ধরনের বই নেই বললেই চলে। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমর দত্ত, দানীবাবু, শিশির ভাদুড়ী,—এঁরা যদি নিজ-নিজ কালের অভিনয়কলার বিস্তারিত পরিচয় লিখে রেখে যেতেন তাহলে আমাদের আক্ষেপ থাকত না। একা অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন "নিজেরে হারায়ে খুঁজি"। কিন্তু তাতে নিজের কথা যত বলেছেন, সমকালের অন্যান্যদের কথা তত বলেন নি। শ্রীশম্ভু মিত্র বা শ্রীউৎপল দত্ত ইচ্ছে করলেই লিখতে পারেন ১৯৪৯ সাল থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দের অভিনয়ের বিকাশ আর বৈচিত্র্যের বিবরণ। তাঁরা তা লেখেন নি। দুজনেই যৎসামান্য লিখেছেন, তাতে মন ভরে না। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নাট্য-ইতিহাস অনির্ভর-যোগ্য। কেবল হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন, কিন্তু কোনো সংগঠিত ধারাবাহিক অভিনয়-ইতিহাস লেখেন নি।

এমতাবস্থায় অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ-লিখিত 'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস' হাতে পেয়ে খুশি হই। অসম্পূর্ণ অবিন্যস্ত উপাদান থেকে তিনি অশেষ শ্রম এবং যত্ন নিয়ে গড়ে তুলেছেন সাড়ে চার শ পৃষ্ঠার নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস। এ প্রসঙ্গে মনে হয়, শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্ত (রমাপতি দত্তের ছদ্মনামে যিনি অমরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনী লিখেছেন) আর শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত ইচ্ছে করলে এই কাজটি করতে পারতেন। এঁদের দুজনের সঙ্গে শ্রীশম্ভু মিত্র, শ্রীউৎপল দত্ত আর শ্রীঅজিতকুমার ঘোষের প্রয়াস যদি যুক্ত হত তবে সোনায় সোহাগা হত। কিন্তু হায়! আমাদের দেশে তা হবার নয়।

তাই যত অসম্পূর্ণই হোক, ড. অজিতকুমার ঘোষের একক প্রয়াসকে সাধুবাদ দিতে হয়। লেখক কেবল নাটক বিষয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন, তা নয়; নিজে অভিনয় করেছেন; অনেক নাট্য-প্রতিযোগিতায় বিচারকের কাজ করেছেন; দীর্ঘকাল অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার ফলে নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস লেখার জন্য তিনি নিজেকে তৈরি করে তুলতে পেরেছেন। "গু অকসফোর্ড কমপানিয়ন টু গু থিয়েটর"-এর মতো বাঙলায় লিখিত বই আজো আমাদের অনায়ত্ত। তাই এই মুহূর্তে আমাদের নির্ভর করতে হয় ড. অজিতকুমার ঘোষের বইয়ের 'পরে। মোটামুটি একশ তের বছরের (১৮৬৮-১৯৮১) বাঙলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস এই বইতে পাই।

বাঙলা নাট্যাভিনয়ের রীতিকে লেখক কয়েকটি পর্বে ভাগ করেছেন: গিরিশ-অর্ধেন্দু যুগের অভিনয়রীতি, শিশির-যুগের অভিনয়রীতি, আধুনিক যুগের অভিনয়রীতি (যার সূচনা ১৯৪৪-এ 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটকের অভিনয়ে)। এ নিয়ে দ্বিমত নেই। লেখক সাম্প্রতিক কালের অপেশাদার নাট্যাভিনয়ক্ষেত্রে যেসব নব নিরীক্ষা চলছে তারও পরিচয় দিয়েছেন, সেই সঙ্গে পেশাদার মঞ্চের হালের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। টোটাল থিয়েটর, থার্ড থিয়েটর, থিয়েটর ইন গু রাউনড প্রভৃতির উল্লেখও করেছেন। অ্যাবসার্ড থিয়েটর, পিপলস থিয়েটরও আলোচিত হয়েছে। এই সঙ্গে ব্রডওয়ে থিয়েটর, অফ-ব্রডওয়ে থিয়েটর, ব্রেখট-প্রবর্তিত থিয়েটর প্রভৃতির বিস্তারিত আলোচনা থাকলে খুশি হতাম।

হালের অপেশাদার অভিনয়ে ব্রেখটীয় রীতির প্রভাব দূরবিস্তারী। লেখক এই রীতির উল্লেখ করেছেন শ্রীউৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে (পৃ ৪১৩-১৬)। কিন্তু তার বিস্তারিত আলোচনা পাই না। গিরিশ-যুগের 'এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে বলা' অভিনয়রীতি থেকে বাঙলা মঞ্চাভিনয়কে মুক্তি দিয়েছিলেন শিশির-কুমার; আর শিশিরকুমারের ছিলা-টান ধনুকের মতো চড়া সুরে বাঁধা অভিনয় থেকে মঞ্চাভিনয়কে মুক্তি দিয়েছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। এই বিষয়টি স্পষ্টতর হলে ভালো হত। তবু যা পাওয়া গেছে তা যথেষ্ট। এবং স্বীকার্য, মাঝে-মাঝে লেখকের এক-একটি দীপ্ত মন্তব্যে আর উপযুক্ত সমর্থক-মন্তব্যে বিষয়টি আলোকিত হয়ে উঠেছে। 'নাট্যাচার্যের নাট্যকলা' (৪/ক অধ্যায়) আলোচনা তার প্রমাণ।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সমাজ, সময়, মানুষের টানাপোড়েন

পদ্মার পলিদ্বীপ—আবু ইসাহাক। মুক্তধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ।
বাতাসীর মা—অজয় ভট্টাচার্য। মুক্তধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ।
নগ্ন আগন্তুক—মঞ্জু সরকার। মুক্তধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাংলা একাডেমীর সাহিত্য-সাময়িকী 'উত্তরাধিকার'-এ "পদ্মার পলিদ্বীপ" উপন্যাসটি ষোলোটি অধ্যায়ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল "মুখর মাটি" নামে। লেখক আবু ইসাহাকের এটি দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রথম উপন্যাস "সূর্য দীঘল বাড়ী" স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তির উদাহরণস্বরূপ শুধুই ওপার নয়, এপার বাঙলায়ও বিশেষ সমাদৃত। বলা বাহুল্য, এর রচনাকাল ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৮৫—এই দীর্ঘ সময় ধরে হলেও "মুখর মাটি"র প্রকাশ ঘটেছিল যে ১৯৭৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬-এর মধ্যে। তারপর মুক্তধারার প্রকাশনায় ১৯৮৬তে "পদ্মার পলিদ্বীপ" নামে উপন্যাসটি দীর্ঘ কলেবরে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। লেখক আবু ইসাহাক ওপার-বাঙলার সাহিত্য-

জগতের এক শীর্ষনাম। ১৯৬২-৬৩ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কারজয়ী আবু ইসাহাকের এই উপন্যাসটিও সাহিত্য-রসাস্বাদক। প্রতিটি ব্যক্তির কাছে চ্যালেঞ্জ রাখার সাহস রাখে। টানাপোড়েন সমাজ-জীবনের জলজ্যান্ত নিখুঁত ছবিতে উপন্যাসটি ভরিয়ে তোলায় লেখক আরেকবার প্রমাণ করলেন নিছক কাহিনী নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিক সমাজব্যবস্থা, জীবনসংগ্রাম, প্রেম, ঘা আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে ভাবায়, প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, কাঁদায়, সেগুলোই সাহিত্যের আসল মূলধন। এই মূল-ধনকে সাহিত্য করে তোলায় আবু ইসাহাকের ক্ষমতা অপরিসীম। তাই এই রচনা সমাজের রসকসহীন প্রিসটেড ডকুমেন্ট হয়ে ওঠে নি।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রচরিত্র ফজল তেমনি এক জীবনসংগ্রামী আটপৌরে মানুষ। 'পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে'—সুতরাং ফজলের ভেতরে নেশাটাও মোচড় দিয়ে ওঠে। মাছ-ধরার নেশা। নেশাটি কবে পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে ফজল জানে না। ফজলের অর্ধাঙ্গিনী রূপজানের কথা ধরা যাক। অনন্যসুন্দরী যুবতী রূপজান মানসিক নির্বাসনে। কেন এই নির্বাসনে? তাও সাংসারিক গোলযোগের একটি ঘটনা। রূপজান এখন বাপের বাড়িতে। অসহ্য নিঃসঙ্গতায় অহোরাত্রি চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কোনো গতি নেই। নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে তোলার জন্য সমস্ত অপমান মাথায় করে মাঝে-মাঝে ফজলও যায়। রূপজানই তার জীবনের একমাত্র প্রতিমা। তার শরীরের প্রতিটি বিন্দুই ফজলের ব্যক্তিগত সম্পদ। সেই সম্পদকে এড়িয়ে থাকা ফজলের পক্ষে খুবই শক্ত। হঠাৎ একদিন জাল ফেলতে-ফেলতে পদ্মার বুকে নতুন চরের সন্ধান পায় সে। খুনে চর। দলবল নিয়ে সেই চর দখল নিতে গেলে বিরোধ লাগে তার শ্বশুর আরশেদ মোল্লার সঙ্গে। আরশেদ মোল্লা তার ঘোরতর শত্রু।

আরশেদ মোল্লাই ফজলকে মিথ্যে অপরাধের দায়ে পুলিশে ধরায়। জেলে থাকার সময় ফজলের বাবা মারা যান। সুযোগ বুঝে একদিন ফজল জেল ভেঙে বেরিয়ে আসে। তখন তার প্রতিশোধ নেওয়াই একমাত্র প্রতিজ্ঞা। কিন্তু শেষমেষ সে তা পারে নি। থানায় আত্মসমর্পণ করার পর তিন মাস জেল। এই সুযোগে আরশেদ মোল্লা মেয়ে রূপজানকে অন্য কোনো পুরুষের হাতে গছিয়ে দেওয়ার জন্য তোড়জোড় চালাতে থাকেন। এতে রূপজানের ঘোরতর আপত্তি। সে জানতে পেরেছে বাবাই চালাকি করে ফজলকে ডাকাতির দায়ে ধরিয়ে দিয়েছে। আসলে ফজল সৎ, আদর্শ পুরুষ। তার প্রাণের একমাত্র পুরুষ। কিন্তু আরশেদ মোল্লার সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যায়। ফজল কর্তব্যপরায়ণতার দরুন চব্বিশ দিন আগে ছাড়া পায়। আরশেদ মোল্লাকে প্রস্তুতির কোনো সুযোগ না দিয়ে খুনে চর দখল নেয়। ফিরে পায় রূপজানকে। বহু প্রতীক্ষায় প্রার্থিত পুরুষটিকে কাছে পেয়ে ফজলের বুকে কাঁপিয়ে পড়ে রূপজান বলে,'...এই দুনিয়া জাহানের কেও আমাগো জোড়া ভাঙতে পারব না।'

মূলত উপন্যাসের মধ্যে লেখকের সেক্স্ অ্যাপীলগুলো অসম্ভব বাস্তব গ্রাম্যতার মধ্যেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জরিনা এই কাহিনীর মুখ্য নারী। সুদীর্ঘ কালের অর্ধ-উচ্চারিত প্রেম-বিনিময়ের আধখোলা মনের তৃষ্ণা সেদিন ফজলের অজান্তে মিটে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একান্ত ঘনিষ্ঠতার মধ্যে জরিনা অনুভব করল পুরুষের স্বাদ। তবে শুধুই সেকস নয়। জরিনা সত্যি-সত্যি ভালোবাসতে জানে। জেল ভেঙে গা ঢাকা দেওয়ার সময় জরিনা কতই না সাহায্য করেছে। সেদিন পাটগাছের জঙ্গলে বেঁহুশ ঘুমের মধ্যে ফজলের নগ্ন উরুতে একটি হলুদ প্রজাপতি বসতে দেখে জরিনা চমকে ওঠে। সে দেখতে পায় রূপ-জানই যেন হলুদ প্রজাপতি হয়ে ফজলের শরীরের ঘ্রাণ নিতে এসেছে। জরিনা পরস্ত্রী বটে। কিন্তু প্রেমের মধ্যে কোনো পাপ সেই। মনের একান্ত ইচ্ছায় পরপুরুষের প্রেমকে সে বিশ্বাস করে।

উপন্যাসের প্রতিটি দৃশ্যে ফুটে উঠেছে নিখুঁত প্রাকৃতিক চিত্র। গ্রাম বাঙলার সোঁদা মাটির গন্ধ। বর্ণনার দিক দিয়েও আবু ইসাহাক চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার নজির রাখেন। যেমন—'পানিতে ভিজে ভিজে সুতো পচে না যায় সে জন্যে লাগানো হয়েছে গাবের রস।' কোথাও কোথাও রোমানটিক-তার উদাহরণ মেলে, 'নতুন ঢেউ টিনের চালার আর পাতটিনের বেড়া নিয়ে ঘরগুলো দিনের আলোয় রোদে চোখ ঝলসায়। রাতে চাঁদের আলোয় .....ঝলমল করে।'

তবে একথা স্বীকার করতেই হয়, আবু ইসাহাক পাঠককে টেনে রাখার জাদু জানেন। গ্রাম্য সেন্টিমেন্টের সঙ্গে ত্রিকোণ প্রেম, ত্রিকোণ প্রেমের সঙ্গে বাস্তব বোধ; বাস্তব বোধের সঙ্গে

গ্রাম্য রাজনীতি, সব মিলিয়ে একটি আদর্শ উপন্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের লেখক অজয় ভট্টাচার্যের "বাতাসীর মা" এপার-বাঙলায়ও সমান কদরে পাঠকের মনজয় নিশ্চিত করবে। কিছু সময় আগে তাঁর 'এঘর-ওঘর ও নীড়' উপন্যাসটিও সৃষ্টি-মানসের প্রমাণ রেখেছিল পাঠকের কাছে। 'বাতাসীর মা'-তে তারই কিছু উন্নত অভিব্যক্তির প্রমাণ পাওয়া গেল। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, অজয় ভট্টাচার্য কৌতূহলী পাঠকের কাছে সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বরূপে বিরাজমান হয়ে উঠছেন।

সেই সঙ্গে আরেকটি কথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে গ্রামবাঙলার সমাজজীবন নিয়ে সাহিত্যে উঠে আসার একটি স্বতঃস্ফূর্ত ট্রাডিশন আছে। মাটির গন্ধমাখা মানুষের কাছাকাছি কলম নিয়ে আসার প্রবৃত্তি। সেখানে আটপৌরে গ্রামের মানুষদের জীবনসংগ্রাম, সংস্কৃতি ইত্যাদি। অজয় ভট্টাচার্যও তার মর্যাদা রেখেছেন মুন্সিয়ানার সঙ্গে।

আলোচ্য উপন্যাস 'বাতাসীর মা' তেমনি এক গ্রামজীবনের ছবিতে মোড়া। কেন্দ্রচরিত্র বাতাসীর মা। বিধবা। অসহায় একটি নারী। তার দুই শিশুসন্তান। আর বুকের মধ্যে বহু স্বপ্নের কুণ্ডলী। বড়ো হওয়ার আশা। রোগজ্বালা, দারিদ্র্য এবং কায়েমি স্বার্থের নিরন্তন ঘাতপ্রতিঘাতে অসহায় বাতাসীর মা বহু স্বপ্নের স্রোতে কেবল মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই স্রোতকে সে আটকাতে পারে না। সে ক্ষমতা তার নেই। তাই মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম। বাঁচার জন্য হতাশা। হতাশার মধ্যে তবু বেঁচে থাকার প্রেরণা খুঁজে বেড়ায়। আর সেজন্যই বাতাসীর মার মৃত্যু জীবনেরই নামান্তর।

সেই কুঁড়েঘরটির কথাই ধরা যাক। বসন্তপুরে বাতাসীর মার আজীবনের একমাত্র ভিটে বাড়ি। বাতাসী আর বীরু দুই সন্তান। অকালেই বিধবা হয় বাতাসী। অপরের বাড়িতে কাজ করে পেট চালায় ওরা। বহু কষ্টের তার সংসার। বড়ো বাড়িতে কাজ করার ফল বাতাসীর মা পায়। লাঞ্ছনা, অপমান। সেই জমিদারি কালচারের কথা বলা যায়। পেটে-খাওয়া মানুষ-দের একসপ্লয়েট করার চিরাচরিত প্রথা। যাকে ধনী ব্যক্তিরা ঐতিহ্য বলে দাবি করে। যাতে ওঁদের আভি-জাত্যের কদর বাড়ে। সুতরাং বাতাসীর মার কর্মস্থল বড়ো বাড়িটির চারপাশে অন্য এক গ্রহের মতো ঘুর-পাক খায় বসন্তপুরের আধপেটা মানুষ-দের বস্তি।

প্রতিবাদ করেছিল বাতাসীর বাপ। কিন্তু খাবে কী? ডাকাবুকো দুলাল জীবিকার সন্ধানে আসামে আসে। নিষ্ফল। সেই একই ক্ষত আরো গভীর করে ফিরে এল নিজের গ্রামে। সর্বত্র সেই এক শোষণ। অত্যাচার। গরিব মানুষদের মেরে ফেলার নিত্যনতুন খেলা। সেই খেলায় টিকে থাকার শক্তি নেই বাতাসীর বাপের। মারা গিয়েছিল সে। সুতরাং উপন্যাসে মনুষ্যত্বের অবমাননার একটি দিক তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন শ্রী ভট্টাচার্য। অথচ নাটকীয়তা এখানেই। যাদের বিরুদ্ধে জীবনমরণ প্রতিবাদ জানিয়ে শেষ পর্যন্ত বাতাসীর বাপ দুলাল মারা গেল, তাদেরই দ্বারস্থ হতে হল বাতাসীর মাকে। শুধু একমুঠো খেয়ে বাঁচার জন্যে। তার চরিত্রে এ এক অদ্ভুত ছবি। মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই। আগে জীবন, তারপর মান-সম্মান। তবে বাতাসীর মা বুঝতে পেরেছিল, এইভাবে কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। ভেতরে-ভেতরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো ফুঁসতে থাকে ক্রোধ। ফুঁসতে থাকে মানুষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। ধনী মানুষ-দের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ।

একসময় চাপা ক্ষোভগুলো জ্বলে ওঠে বাতাসীর মায়ের মতো গৃহভৃত্য-দের মধ্যে। লড়াই চলে মনিবের সঙ্গে চাকরের। লড়াইয়ে বীরু মারা গেল। বসন্তপুরের দরিদ্র মানুষরা যক্ষার মতো ধুঁকতে থাকে। শক্তিহীন তারা। তাদের জন্যে জয় নয়। জয়ের আরেক নাম অর্থ-প্রতিপত্তি। এসব তো তাদের নেই।

উপন্যাসের কিছু-কিছু জায়গায় নাটকীয়তা থাকলেও চরিত্রগুলি বাস্তব সমাজজীবনের জ্যান্ত প্রতিচ্ছবি। বিশেষ করে জগৎবাবু, চক্কতি বা ভট্টাচার্যমশাইয়ের মতো চরিত্রগুলি আমাদের পারিপার্শ্বিক গ্রামবাঙলার তৈলচিত্রস্বরূপ। যারা কায়েমি স্বার্থের পুঁজি নিয়ে বেঁচে আছে। সুখে বেঁচে আছে। সুতরাং ছকে-ফেলা সামাজিক উপন্যাসের মতো অজয় ভট্টাচার্য উপন্যাসটিকে ছাঁচে ফেলেন নি। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়েছে। 'বাতাসীর মা' শ্লোগান নয়। চিরন্তন জীবনের অভিব্যক্তি। টানাপোড়েন জীবনসংগ্রামের প্রতি-চ্ছবি।

গ্রামবাঙলার চিরাচরিত ট্রাডিশান-

টিকে লেখনীতে তুলে ধরার জন্য মঞ্জু সরকার অবশ্যই বাহবা পাবেন। সেই ক্ষমতার ঘনীভূত সৃষ্টিমানসের অভিব্যক্তিস্বরূপ পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন 'নগ্ন আগন্তুক'। উপন্যাসটি পড়তে-পড়তে চোখের সামনে ভেসে উঠছিল অজ-পাড়াগাঁয়ের মানুষজনের মুখ। ঘোমটাটানা মেয়েদের কু-সংস্কারাচ্ছন্ন একঘেয়ে জীবন।

রহমতের চরে একটি নগ্ন আগন্তুককে নিয়ে উপন্যাসের গোড়াপত্তন। গ্রামের লোকেদের কৌতূহল। আগের একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষেরা নগ্ন আগন্তুককে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ভাবে। দেখভালের তোড়জোড় লাগে। করিম মোল্লা গ্রাম্য সংস্কারে বিশ্বাসী। আল্লার নির্দেশ ছাড়া পৃথিবীতে গাছের একটি পাতাও নড়ে না—সমস্ত অন্তর দিয়ে এ সত্য বিশ্বাস করে মোল্লা। আজ অলৌকিক আগন্তুককে তার বাড়িতে আবির্ভূত করানোর পেছনে নিশ্চই খোদার গোপন নির্দেশ আছে, মহৎ কোনো অভিপ্রায় আছে—যা বোঝার চেষ্টায় খোদাপ্রেম করিম মোল্লার মন গলে যায়…। আসলে গ্রামের অসহায় মানুষের অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্ধত্বের প্রধান কারণ। যে দেশে নিয়তির শিকলে বন্দী মানুষ এরোপ্লেন দেখে নি—যেখানে মাছের পিঠে চড়ে এমন একজন ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন ক্ষমতাবান পুরুষের আবির্ভাব প্রত্যাশিত ঘটনা যেন।

হঠাৎ ঘটনাটি মোড় নিল অন্য দিকে। সালমাকে টানতে-টানতে নগ্ন দরবেশটি নিয়ে যাচ্ছিল দেখে হানিফ স্থির থাকতে পারে নি। নগ্ন দরবেশকে মেরে ফেলেছিল। গ্রামের লোকজন হানিফকে সন্দেহ করলেও সেই সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছিল হানিফ। সালমাকে নিয়ে গ্রামছাড়া হওয়ার জন্য জমিজমা বিক্রি করে দিয়েছিল গোপনে। কিন্তু পারে নি। হানিফকে খুন করেছিল ডাকাতরা। সুতরাং একটি নগ্ন আগন্তুককে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির ভাঙাগড়া। ভাঙাগড়ার মধ্যেই গ্রামবাঙলার চিরন্তন ছবি ফুটে উঠেছে।

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

মে সংখ্যার আংশিক সূচী

অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যের
রবীন্দ্রনাথ ও অ্যানি বেসান্ত
(কিছু অপ্রকাশিত তথ্যসংবলিত প্রবন্ধ)

প্রণতি মুখোপাধ্যায়
জাতীয় সংগীত নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক প্রসঙ্গে

অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রনাথ : মানবতা ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে

ড. কান্তি গুপ্ত
'কালের যাত্রার ধ্বনি'

পিকাসোর গ্র্যাফিক্‌স্

পিকাসো কি তাঁর মৃত্যুর চোদ্দ বছর পরেও হয়ে আছেন পাশ্চাত্ত্যের সবচেয়ে প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী? শুধু পশ্চিমী দেশগুলিতেই নয়, দুনিয়া জুড়ে সর্বত্র শিল্পের ক্ষেত্রে পিকাসোর অপ্রতিরোধ্য আর সুগভীর প্রভাব নিশ্চয়ই তাঁর শিল্পভাবনার সমকালীন সর্বজনীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করছে।

বাস্তবিক পক্ষে, পিকাসোর দৃষ্টিতে বস্তু যে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এক ফর্‌ম্যাল বিন্যাসে রূপায়িত, তারও ধারাবাহিকতা আছে—পশ্চিমী চিত্রকলার ছাত্রমাত্রেই একথা জানেন। প্রাচীন ইতালীয় চিত্রকর পিয়েরো দেলা ফ্রান্‌চেস্‌কা আর আফ্রিকার মুখোস ও আদিম ভাস্কর্য থেকে এল গ্রেকো, সেজান, তুলুজ্‌ লোত্রেক, দেগা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে পিকাসোর উত্তরাধিকার প্রবাহিত। আর, পিকাসোর রচনার অনন্যসাধারণ রৈখিক বা লিনিয়র গুণ তো অবশ্যই তাঁর পূর্বসূরীদের ওই বৈশিষ্ট্যটিকে আত্মস্থ করার পরে, এক নূতন মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আধুনিক পশ্চিমী শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসেবে পিকাসোর স্থানটি বোধহয় এখানেই নির্দিষ্ট।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সাধারণভাবে পিকাসোর নানা রচনায় একদিকে যেমন বস্তুরূপের যে-কোনো একটি ফর্‌ম্যাল উপাদানকে দিয়ে অন্য কোনো-একটি বা একাধিক উপাদানের কাজ করিয়ে নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এর উলটোটাও ঘটানো হয়েছে বহু ক্ষেত্রে: একই রচনায় একাধিক ফর্‌ম্যাল উপাদানের সমন্বয়কে দিয়ে একটি বিশেষ উপাদানের কাজ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঐতিহ্যকে আত্মকরণের মধ্যে দিয়ে, বস্তুরূপ উপস্থাপনার এক অনন্য স্বকীয়তায় উত্তরণ, এবং সমকালীন চারু ও কারুশিল্পের উপরে অত্যন্ত ব্যাপক আর গভীর প্রভাব বিস্তার—এই দুইই পিকাসোকে করে তুলেছে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিল্পের অগ্রগণ্য প্রতিভূ।

পিকাসোর ড্রইংএর অপূর্ব দক্ষ ও সাবলীল রৈখিক বিন্যাস চিত্রকল্পের দিক থেকে নিও-ক্লাসিসিস্ট। মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে তা নিও-ক্লাসিসিজম্‌-এর ব্যক্তিকেন্দ্রিক নান্দনিক প্রত্যয়ের সন্ধানে অনুধ্যানমূলক এক পরিকল্পিত লক্ষ্যে এগুনোর চেয়ে, বরং একটা স্বতঃস্ফূর্ত সংবেদনশীলতা আর

চিত্রকলা

সৃজনশীল উর্বরতার উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করে—যেটা ইলাস্‌ট্রেশনধর্মী কাহিনীমূলক চিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। পিকাসোর ক্ষেত্রে এটাও—এই বিমূর্ততাকে অতিক্রম করে আসাটাও—যেন একটা স্ববিরোধ।

এইসব অনুভবের মুখোমুখি দর্শককে দাঁড়াতে হয়েছে পিকাসোর ষাটটি গ্র্যাফিক রচনার মূল প্রিন্‌ট্‌ দেখার বিরল সুযোগ পেয়ে। কলকাতায় ২ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত বিড়লা অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত পিকাসোর এই এচিং এন্‌গ্রেভিং লিথোগ্রাফ লাইনোকাট ইত্যাদির প্রদর্শনীটির যুক্ত উদ্যোক্তা ছিলেন ইনডিয়ান কাউনসিল ফর কালচারাল রিলেশন্‌স্‌ এবং বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যানড কালচার। পিকাসোর গ্র্যাফিক্‌স্‌-এর মূল প্রিন্‌টের এরকম একটি বড়ো ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্যে উদ্যোক্তাদের প্রতি কলকাতার শিল্পানুরাগীরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ। সংখ্যায় ষাট এবং রচনাকাল ১৯০০ থেকে ১৯৭১—মোটামুটি চল্লিশ বছর জুড়ে। প্রত্যেকটিই সুনির্বাচিত এবং পিকাসোর রচনাবলীর প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য। (প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, বছর কয়েক আগে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ এক প্রদর্শনীতে পিকাসোর মাত্র কয়েকটি ছোটো রচনা দেখার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল বটে, কিন্তু সংখ্যায় নিতান্ত কম আর গৌণ ধরনের কাজ হওয়ায় তা কারু মনে দাগ কাটে নি)।

এই প্রদর্শনীতে পিকাসোর গ্র্যাফিক কাজগুলির বেশির ভাগই বর্ণনাত্মক, ইলাস্‌ট্রেটিভ, কাহিনীভিত্তিক। অনেকগুলি রচনারই বিষয়বস্তুর উৎস প্রাচীন আর মধ্যযুগীয় পুরাণকথা: মিনোটর, ফন, ব্যাকস, অ্যরজি, প্যান, নাইট ও পেজ, ল্যান্সধারী নাইট (ডন কুইক্‌সোটের স্মারক), পিকাসোর প্রিয় প্রিয় বিষয় ঘোড়া (অ্যাপোক্যালিপ্‌স্‌-এর স্মারক) আর ষাঁড় (একই সঙ্গে, জিউস-কর্তৃক ইয়োরোপা-হরণ আর স্পেনের জাতীয় ক্রীড়া বুলফাইটের স্মারক—'গ্যেরনিকা'-য় পিকাসো এই ষাঁড়কেই করে তুলেছেন গোটা স্পেনের প্রতীক); আছে বেশ কিছু প্রতিকৃতি: রেমব্রান্‌ট্‌, দেগা ক্রোমেলিন্ধ, পিকাসোর একদা-সঙ্গিনী ফ্রাঁসোয়া, অনেকগুলি নারীমূর্তি ও মুখাবয়ব; শান্তির প্রতীক: রামধনুর মধ্যে দিয়ে উড়ন্ত কপোত; অনেকগুলি স্টুডিও দৃশ্য:

মডেল সমেত ভাস্কর বা চিত্রকর; ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে, শুধু দৃষ্টিগ্রাহ্য ফর্‌ম্যাল আবেদন সৃষ্টি করলেই চলবে না; বিবরণমূলক হতে হবে বলেই, সেই ফর্‌ম্যাল আবেদন ছাড়াও, অতিরিক্ত এক প্রবল প্রাণবন্ত সরলতায় শিল্পী যেন এখানে বিমূর্ততা থেকে, শিল্পের সার্থকতার তাগিদেই স্বাভাবিকভাবে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন প্রায়-প্রত্যক্ষতায়। এবং এই রচনাগুলিতে পিকাসোর রেখার টান যেমন সুনির্দিষ্ট, সহজ আর স্বচ্ছন্দ, তেমনি কাব্যসুষমামণ্ডিত।

আর, তেমনি অসাধারণ এগুলির কারুকৃতি, ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানশিপ। পিকাসো তাঁর শিল্পীজীবনের প্রায় গোড়া থেকেই পেনটিং-এর পাশাপাশি গ্র্যাফিকস-এর কাজ করে এসেছেন। (ভাস্কর্যের দিকে ঝুঁকেছিলেন অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে)। সুতরাং গ্র্যাফিকস-এর কারু-কৌশলগত দক্ষতা, টেকনিক্যাল নিপুণতা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তে থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর পেনটিং আর ভাস্কর্যগুলির সঙ্গে তুলনা করলে, একটা কথা বিশেষভাবে মনে না হয়ে পারে না: গ্র্যাফিকস-এর ক্ষেত্রে তিনি এত নিরলঙ্কার, বাহুল্যবর্জিত, ফর্‌ম্ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার জটিলতা থেকে মুক্ত আর লিরিক্যাল হলেন কী করে? পেনটিং-এর ক্ষেত্রে বস্তুরূপের এত জটিল সব বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ, দ্বন্দ্ব-সমন্বয় থেকে পিকাসো কি এক সহজ প্রত্যক্ষতার মধ্যে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন এই গ্র্যাফিক্‌স্‌-এর ক্ষেত্রে?

প্রশ্নটা আগ্রহ জাগাবার মতো।

রবীন্দ্র মজুমদার

মার্চ সংখ্যায় ৮৪৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "গাছের আগায় নয়" কবিতাটিতে তিনটি সংশোধন আছে। ১ম লাইনে শুদ্ধ পাঠ 'দীন', ৪র্থ লাইনে 'মহাশের', ৫ম লাইনে 'শূন্যে'।

তৃতীয় থিয়েটার এবং বাদল সরকার

'থার্ড থিয়েটার উঠে এসেছে একটা বিশেষ দেশের, একটা বিশেষ যুগের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে। সেই পরিস্থিতিই দাবি করছে এরকম ধরনের থিয়েটারের। এবং সেটা আমাদের কাছে এতই পরিষ্কার, আমি জানি না অন্যদের কাছে পরিষ্কার কিনা, যে আমরা জানি বাদল সরকার না জন্মালেও বা নাটক না করলেও এই থিয়েটার আসত।' সর্বাঙ্গে-প্রত্যয়-জড়ানো এই উক্তির বক্তা আর কেউ নন, থার্ড থিয়েটারের প্রবক্তা বাদল সরকার স্বয়ং। গত কুড়ি বছর ধরেই পশ্চিম বাঙলার নাট্যজগতে বাদল সরকার একটি উল্লেখযোগ্য নাম। স্বাধীনতা-উত্তর কলকাতা তথা পশ্চিম বাঙলার নাট্যচর্চার তথাকথিত গণমুখী অংশটি যখন গণনাট্য-আন্দোলনের আদর্শ এবং সামাজিক তথা রাজনৈতিক অঙ্গীকারকে সম্পূর্ণতই গ্রুপ-থিয়েটার আন্দোলনের আঙিনায় উৎসর্গ করে এক বিরাট গুরু দায়িত্ব সম্পাদনের আনন্দে মশগুল, যখন কলকাতা এবং পশ্চিম বাঙলার বড়ো, মেজো, সেজো, ছোটো—সব ধরনের মফসল শহরেই ব্যাঙের ছাতার মতো থিয়েটার গ্রুপ গজিয়ে উঠছে নানা-বিধ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডকে সাংস্কৃতিক ফুয়েল দিয়ে উজ্জীবিত করার তাগিদে, যখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে প্রথম কংগ্রেসবিরোধী হাওয়া ধীরে-ধীরে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে এক সর্বাত্মক নির্বাচনী ঝড়ে, ঠিক সেই সময়ে বাদল সরকার নামক এক চল্লিশোর্দ্ধ বাঙালি ইনজিনীয়ার প্রবেশ করলেন এদেশের নাট্যজগতে। পরোক্ষ অনুপ্রবেশ অবশ্য এর আগেই ঘটেছিল। "সারা রাত্তির", "প্রলাপ", "যদি আর একবার" এবং "পাগলা ঘোড়া"র রচয়িতা পশ্চিম বাঙলার নাট্যকর্মীদের কাছে এর আগেই পরিচিত ছিলেন প্রতিভাবান নাট্যকার হিসেবে। এ ছাড়াও ছিল দু বছর আগে, ১৯৬৫ সালে, শৌভনিক-প্রযোজিত সাড়া-জাগানো নাটক "এবং ইন্দ্রজিৎ"-এর মুগ্ধতা। কিন্তু সদ্য-আফ্রিকা-ফেরত এই নাট্যকার শুধুমাত্র কলম হাতে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চান নি।—প্রত্যাবর্তনের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জড়িয়ে পড়লেন নাট্যচর্চার প্রয়োগের ক্ষেত্রে। তৈরি হল "শতাব্দী" নাট্যদল। সেটা ছিল

নাটক

১৯৬৭ সাল। ওই সময়ে বাদল সরকারের জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার মধ্য দিয়ে। নাটকের দল গঠন করার অভিপ্রায় নিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীর খোঁজে সংবাদপত্রে একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন শ্রী সরকার। কয়েক দিনের মধ্যেই প্রায় ন-শ জন উৎসাহীর আবেদনপত্র জমা পড়ে। নাট্যপিপাসু বাঙালি দর্শক, অভিনেতা অভিনেত্রী এবং সমঝদারদের কাছ থেকে দলগঠনের আগেই এই অভ্যর্থনা সম্ভবত বাদলবাবুরও কল্পনার মধ্যে ছিল না। এর পর কেটে গেছে দীর্ঘ কুড়িটি বছর। একাধারে নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা এবং তৃতীয় থিয়েটারের অবিসংবাদী তাত্ত্বিক আর ব্যাখ্যাকার বাদল সরকারের পরিচয় দিতে কোনো ভূমিকাই আজ অপ্রয়োজনীয়। সৃষ্টিশীলতার প্রতিটি দিক বিশ্লেষণ করা এই নিবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়। "তৃতীয় থিয়েটার এবং বাদল সরকার" এই শিরোনামেই সম্ভবত প্রতিবেদকের অভিপ্রায় স্পষ্ট।

১৯৬৭ সালে "শতাব্দী" গঠন করার প্রায় পাঁচ বছর পর ১৯৭১-এর শেষ প্রান্তে এসে "এবং ইন্দ্রজিৎ"-এর নাট্যকার বাদল সরকার মঞ্চের গণ্ডি ভেঙে সরাসরি নেমে এলেন দর্শকের একেবারে মাঝখানে—মুছে ফেললেন মেক-আপ, খুলে ফেললেন থিয়েটারি ড্রেস, উড়িয়ে দিলেন রকমারি সেট এবং চোখঝলসানো আলোর রোশনাই। আলবেয়ার কামুর মতো এই নতুন ধারার থিয়েটারও যেন সগর্বে বলে উঠল, 'No style is the best style'।

একাত্তর সালের ২৪শে অকটোবর নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক-সমিতির প্রেক্ষাগৃহে 'সাগিনা মাহাতো' নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে যে থিয়েটার শুরু করেছিল এক অভিনব যাত্রা, আজ তা-ই শৈশব এবং কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যের দোরগোড়ায় উপস্থিত—অন্তত বয়সের বিচারে। মধ্যবর্তী ষোলো বছরে পশ্চিম বাঙলার রসগ্রাহী দর্শকদের এঁরা উপহার দিয়েছেন "স্পার্টাকুস", "ত্রিংশ শতাব্দী", "মিছিল", "ভোমা", "সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস", "লক্ষ্মী-ছাড়ার পাঁচালী", "খাট মাট ক্রিং", "জন্মভূমি আজ" প্রভৃতি প্রযোজনা। আর আজ এই মুহূর্তে "শতাব্দী"র তৃতীয় থিয়েটারে নিবেদিত শিল্পীরা মহড়া দিয়ে চলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার

Simon Barney-পরিচালিত,Mtwa এবং Ngunar-র লেখা একটি প্রহসন-ধর্মী নাটকের। বৈষম্যবিরোধী এই নাটকের নাম Woza Albert, যার আঙ্গিকের সঙ্গে বাদলবাবুর তৃতীয় থিয়েটারের সাদৃশ্য চোখ এড়ায় না। গত ষোলো বছরে বাদলবাবু এই তৃতীয় থিয়েটার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়—কখনো অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর দোতলায়, কখনো সিন্ধুভবনে, কখনো-বা কলেজ স্ট্রীটের থিওসফিকাল সোসাইটি হলে। মাঝে-মাঝে প্রত্যয়ের আতিশয্যে নেমে এসেছেন কারজন পার্কের উন্মুক্ত জমিতে। তৃতীয় থিয়েটারের মূল লক্ষ্য শহর নয়—গ্রাম। "ভোমা", "মিছিল" প্রভৃতি প্রযোজনা নিয়ে দুর্গম সুন্দরবন পর্যন্ত ঘুরে এসেছেন তৃতীয় থিয়েটারের কর্মীরা। ১৯৮৬-র মার্চ মাসে এঁরা বেরিয়েছিলেন এক অভিনব সফরে। তিন দিনধরে ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তৃতীয় থিয়েটারের সংসারে "শতাব্দী" এখন আর নিঃসঙ্গ নয়। গ্রামপরিক্রমায় তাঁর সঙ্গী ছিল আরও পাঁচটি গোষ্ঠী। বাদল সরকারের মতো এঁরাও হয়তো বিশ্বাস করেন, ভারতবর্ষের মতো একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশে "যেখানে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে শুধু পার্থক্য নয় একটা বিরোধও আছে, যেখানে গ্রামকে শোষণ করছে শহর, যেখানে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল জুড়ে বঞ্চিত এবং দরিদ্র মানুষের বাস অথচ যাদের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে যেটা অবশ্যই Western oriented সংস্কৃতি নয়" সেখানে গণমুখী নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে "ভবিষ্যৎ যদি থেকে থাকে তবে এই থার্ড থিয়েটারেরই আছে।" প্রসেনিয়াম থিয়েটার দেখতে অভ্যস্ত শহুরে মধ্যবিত্ত দর্শকের সামনে এতকাল থিয়েটার করার পর এই গ্রামপরিক্রমায় তৃতীয় থিয়েটারের কর্মীরা মুখোমুখি হলেন এক নতুন দর্শকের। বাদলবাবুর ভাষায়—

"সারা গ্রাম মন্থন করে, ছেঁড়া প্যান্ট ছেঁড়া ফ্রক / অগণন গুঁড়ো-গাঁড়া, শিশু-কোলে জনকজননী, / খালি গায়ে খালি পায়ে খালিপেট চাষার পল্টন / জনে জনে জমা হয়। ঢোলে চাঁটি পড়ে, / গানে গানে মন নাচে, শুরু হয় / নাটকের আদান-প্রদান।"

গ্রামপরিক্রমার অভিজ্ঞতায় সমৃপৃক্ত, তৃতীয় থিয়েটারের প্রবক্তা, বাদল সরকার এখন নিয়মিত কলকাতা শহরে নাটক করার উৎসাহ পান না। থিওসফিকাল সোসাইটি হলে আজকাল আর প্রতি শুক্রবার "মিছিল", "ভোমা" দেখা যায় না—পরিবর্তে বাদলবাবুর নেতৃত্বে কখনো জগৎবল্লভপুর, কখনো সীতাপুর, কখনো বারাসাত, হৃদয়পুর, বা আরও দূর কোনো গ্রামে, মফসল শহরে বা গঞ্জে ঘুরে বেড়ান শতাব্দীর কর্মীরা। পশ্চিম বাঙলার সহস্রাধিক গ্রামে এইভাবে ছড়িয়ে পড়তে চায় তৃতীয় থিয়েটার—ছড়িয়ে দিতে চায় থার্ড থিয়েটার-নামক আন্দোলনকে, তার দর্শন এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে। গত ১৪ই এবং ২১শে জানুয়ারি পরপর দুটি বুধবার সকালে মুখোমুখি হয়েছিলাম শ্রী বাদল সরকারের সঙ্গে। দীর্ঘ আলাপচারিতার মাঝে-মাঝেই আমার রকমারি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন উনি। ষাটোর্ধ্ব এই যুবকের প্রাণশক্তি এবং সপ্রতিভতা সত্যিই বিস্ময়কর। এই নিবন্ধে আলোচনা করতে চাই তৃতীয় থিয়েটার নামক নাট্য-আন্দোলনের তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, এর ভবিষ্যৎ এবং প্রাসঙ্গিকতা। গত ষোলো বছরে "শতাব্দী" এবং অন্যান্য তৃতীয় থিয়েটারে বিশ্বাসী গোষ্ঠী যেসব নাটক এই বিশেষ নাট্যরীতি অনুসরণ করে প্রযোজনা করেছেন তাদের সাফল্য, ব্যর্থতা বা আঙ্গিকগত দিক নিয়ে কোনো আলোচনা ফাঁদতে চাই না। এ ব্যাপারে শ্রী সরকার-রচিত 'The Third Theater' 'The Changing Language of Theater' এবং 'থিয়েটারের ভাষা' এই তিনটি বইয়ের সাহায্য ছাড়াও বিশেষভাবে ঋণ স্বীকার করতে চাই শ্রদ্ধেয় বাদল সরকারের কাছে।

জন্মলগ্ন থেকেই তৃতীয় থিয়েটার এক বিতর্কিত নাট্যপ্রসঙ্গ। সত্তর দশকের বিভিন্ন সময়, এমন-কি আশির দশকেও প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রতিনিধি এবং সমর্থকরা বাদলবাবু এবং তাঁর থার্ড থিয়েটারকে কটাক্ষ করেছেন বিভিন্নভাবে। বাদলবাবুও নীরব থাকেন নি। স্বপ্রবর্তিত নাট্যধারাটিকে প্রায় একক চেষ্টায় টেনে নিয়ে এসেছেন দিনের পর দিন। আলোচনার সুবিধার জন্যই নিবন্ধের পরবর্তী অংশে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে চাই। এই পর্যায়ে আমরা থার্ড থিয়েটার সংক্রান্ত কিছু প্রাসঙ্গিক এবং বহু-আলোচিত, বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর জেনে নেব এই নাট্যধারার প্রধান পুরুষ বাদল সরকারেরই মুখ থেকে। তার পর ওঁর ব্যাখ্যার আলোতে এবং ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বা পরিমণ্ডলকে সামনে রেখে বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করব থার্ড থিয়েটারের ভবিষ্যৎ, প্রাসঙ্গিকতা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দিক।

প্রশ্ন : ১৯৬৭ সালে "শতাব্দী" নাট্যদল গঠন করার প্রায় পাঁচ বছর পর আপনি থার্ড থিয়েটার নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। বাঙলা নাট্যজগতের তৎকালীন অবস্থা, বিদেশী নাট্যধারার প্রভাব বা থিয়েটার-বহির্ভূত আর্থ-রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি (তদানীন্তন) থেকে, ওই পাঁচ বছর ধরে অর্জিত কোনো অভিজ্ঞতাই কি আপনাকে এই নতুন পরীক্ষার দিকে ঠেলে দিয়েছিল ?

উত্তর : বাস্তবিক অর্থে এর সবকটাই ঘটেছিল, কোনোটা বাদ নয়। "শতাব্দী" সৃষ্টির আগেও আমি বিক্ষিপ্তভাবে থিয়েটার করেছি। ১৯৬৭ সালে যখন প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে গ্রহণ করি, তখন কলকাতা শহরে ঐ থিয়েটার—যাকে আমি দ্বিতীয় থিয়েটার বলি, চালু থাকার জন্যই স্বাভাবিকভাবে, কলকাতা শহরের একজন মানুষ হিসাবে আমি ঐ থিয়েটারকে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু সে সময়ই আমার অন্য কতগুলি চিন্তা মাথায় ছিল—এক দিক দিয়ে বিচার করলে সেটা কিছুটা ভাষা-ভাসা ফর্‌মুগত চিন্তা, আর অন্য দিক দিয়ে বিচার করলে সেটা তৎকালীন সোসিও-পোলিটিকাল অবস্থা থেকে জাত অভিজ্ঞতা-প্রসূত। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে ওই প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে গ্রহণ করে "শতাব্দী"ও আর-পাঁচটা গ্রুপ থিয়েটারের মতো একটা গ্রুপ হল। "শতাব্দী"-র আগেও নাটক করেছি "চক্র"-নামক একটি সংস্থার পক্ষ থেকে। চক্র ঠিক থিয়েটার গ্রুপ ছিল না, কালচারাল অরগানাইজেশন ছিল, কিন্তু নাটকও ওরা করত। 'শতাব্দী'-ই প্রথম পুরোপুরি নাটকের দল। নাটক করতে-করতেই কতগুলো অভিজ্ঞতা আসে। আমার প্রথম এসেছিল সিনেমা এবং থিয়েটারকে পাশাপাশি রেখে—বিশেষ করে গ্রুপ থিয়েটারকে। কারণ আমরা জানি, একটা ভালো ঐতিহ্যের পর আমাদের প্রফেশনাল থিয়েটার সম্পূর্ণভাবে কমারশিয়ালাইজড হয়ে যায়। পিছনে-পড়ে-থাকা কিছু ক্রুড নাটক নিয়েই মেতে থাকার জন্য সেখান থেকে নতুন করে আর কিছুই পাওয়ার ছিল না। এই অবস্থায় একমাত্র ভরসা ছিল গ্রুপ থিয়েটার। যদিও গ্রুপ থিয়েটার একটা ক্লায়েনটেল জোগাড় করেছে, কিন্তু সিনেমার আকর্ষণ অনেক বেশি। এখানে দাঁড়িয়ে সিনেমা এবং থিয়েটারের তুলনামূলক আলোচনাও চলে আসে। আমার মনে হতে থাকে, থিয়েটারকে যদি তার স্বকীয় মর্যাদায় দাঁড়াতে হয় তবে থিয়েটারের কোথায় জোর, তার এমন কী বৈশিষ্ট্য আছে যা সিনেমা নকল করতে পারবে না, এসব নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। থিয়েটার একটা লাইভ শো—জীবন্ত মানুষের সঙ্গে জীবন্ত মানুষের সরাসরি যোগাযোগ—যা সিনেমা, টিভি বা ভিডিওতে নেই। থিয়েটারের এই বৈশিষ্ট্যের উপরই আমার নজর পড়ে, এবং তারই পরিণতি হিসেবে প্রসেনিয়াম থিয়েটার থেকে অঙ্গনমঞ্চে নেমে আসা, যেখানে দর্শক এবং অভিনেতার মধ্যেকার বাধাটা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের তুলনায় অনেক কম। তার উপর এই অঙ্গনমঞ্চে থিয়েটার সংক্রান্ত বিভিন্ন খরচ—যেমন সেট, লাইট, কসটিউম, মেক-আপ ইত্যাদির খরচও অনেক কমে যায়। এর পরেই আসে আমাদের দেশের সোসিও-পোলিটিকাল রিয়লিটির প্রসঙ্গ, কারণ এই থিয়েটারের আর একটা পসিবিলিটি এই যে, একে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব। প্রসেনিয়াম থিয়েটার টাকার দিক থেকে, তার প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক বা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দিক দিয়ে ভীষণভাবে rooted, চট করে কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় না। তখন একটা ওই নমনীয়, বহনীয় এবং সুলভ থিয়েটারের সম্ভাবনা সামনে আসে, সুতরাং একসঙ্গে দুটো কাজই হয়। মানে থিয়েটারের যে যোগাযোগের ক্ষেত্রটা তাও হয়, এবং ফ্রী থিয়েটার হওয়ায় নিয়ে যাওয়া যায় এবং বিনে পয়সায় লোককে দেখানো যায়।

পরিবর্তনের এই প্রসেসটা পাঁচ বছর ধরেই হয় নি—তারও আগে থেকে শুরু হয়েছিল এটা। এবং এই প্রসেসটা কিন্তু শুধুমাত্র সোসিও-পোলিটিকাল রিয়লিটির জন্যও হয় নি, আবার শুধুমাত্র বিদেশের অভিজ্ঞতার থেকেও হয় নি বা আমাদের "শতাব্দী"-র ইতিহাসের মধ্য থেকেও হয় নি—রাতারাতি হয় নি। এবং ট্রানজিশানটাও যখন হয়েছে, রাতারাতি হয় নি। অল্পে অল্পে হয়েছে। প্রথমে "সাগিনা মাহাতো" নিয়ে দুটো ট্রায়াল শো করা, তারপর অ্যাকাডেমীর তিন তলার ঘরে 'অঙ্গনমঞ্চ' শুরু করার পরও ছ-সাত মাস আমাদের এরকমও গেছে যে একই সঙ্গে প্রসেনিয়ামেও করছি আবার অঙ্গনমঞ্চেও করছি। তারপর ওই কনভিকশনটা তৈরি হবার পর পাকাপাকিভাবে প্রসেনিয়াম ছেড়ে চলে

আসি।

প্রশ্ন : ৬০-এর দশকের মধ্য ভাগ থেকে পশ্চিমী দুনিয়ায়, বিশেষ করে ইউরোপে, পোলিশ নাট্যকার-পরিচালক গ্রোটোভস্কির নেতৃত্বে যে নতুন নাট্য-আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার থেকে আপনি কি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ?

উত্তর : এটা অনেকেই মনে করেন—কেন মনে করেন জানি না। অনেকের ধারণা আমি গ্রোটোভস্কির সঙ্গে কাজ করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। তথ্যগত অজ্ঞতা আর কী! ১৯৬৯ সালে একটি কালচারাল একসচেনজ প্রোগ্রামে আমি পূর্ব ইউরোপের তিনটি দেশে যাই। পোল্যানডে দু সপ্তাহ ছিলাম। ওই সময় ভারতবর্ষে গ্রোটোভস্কির নাম শুনেছেন এমন লোকও খুব কম ছিলেন। কিন্তু একজন আমাকে বলেন ওঁর সম্পর্কে। আমি খুব ক্যাজুয়াল ইনটারেসটে ওই শহরে গিয়ে পড়েছিলাম বলেই গ্রোটোভস্কির সঙ্গে দেখা করার একটা ব্যবস্থা করি। উনিও রাজি হন। সেই সময় গ্রোটোভস্কির একটি নাটক ওই শহরে অভিনীত হচ্ছিল বলে উনি বলেন, ওই নাটকটা দেখে কথা বললে সুবিধে হবে। এর আগে ওঁর সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই জানতাম না। নাটকটি দেখতে যাবার আগে একজন আমাকে "টুওয়(র)ডস এ পুয়োর থিয়েটার" বইটি দু ঘন্টার জন্য ধার দেন। উলটেপালটে একটু দেখেছিলাম, কাজেই গ্রোটোভস্কির সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল তাকে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিই না। বরং ওই বইটা এবং ওঁর থিয়েটার দেখার পর আমি যথেষ্ট ইমপ্রেসড হই। থিয়েটারটির নাম Apocalypsis Cum Figuris। কিন্তু নাটকটি দেখার পর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনে হয়, এই ধরনের থিয়েটার আমাদের কাছে রেলেভ্যান্ট নয়, তা ছাড়া আমাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। আমি সেইভাবেই ইনটারেসটেড হই। সুতরাং গ্রোটোভস্কির থিয়েটার সম্পর্কে ফিলসফির অনেকগুলো জিনিস আমার কাছে সত্য বলে মনে হলেও, গ্রোটোভস্কির যে এনডপ্রোডাকট থিয়েটার, তার সঙ্গে আমাদের থিয়েটারে কোনো অংশে মিল আছে বলে আমি মনে করি না। যাঁরা ওঁর নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে বলেন, আমার ধারণা তারা গ্রোটোভস্কিও জানেন না, আমাদের থিয়েটারও জানেন না। কিন্তু এটা চালু হয়ে গেছে, এবং একজন আর-একজনেরটা নকল করে লিখে লিখে দিচ্ছেন প্রত্যেকবার। গ্রোটোভস্কির থিয়েটারের সঙ্গে আমাদের থিয়েটারের যে ফানডামেনটাল ডিফারেনস সেটা হচ্ছে গ্রোটোভস্কির থিয়েটার দেখে মনে হয়েছে, ওঁর থিয়েটারে যেমট্রিকাল কমিউনিকেশন ব্যাপারটাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে এবং তা শরীরের মাধ্যমে। বিষয়বস্তু ওঁর থিয়েটারে মুখ্য নয়। আর আমাদের থিয়েটার শুরুই হচ্ছে বিষয়বস্তু থেকে, ফর্ম্ যেখানে গৌণ। এখানেই গ্রোটোভস্কির অ্যাপ্রোচের সঙ্গে আমাদের অ্যাপ্রোচের মূলগত পার্থক্য।

প্রশ্ন : প্রায় পনেরো বছর এই থার্ড থিয়েটার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর আপনার আজ কী মনে হচ্ছে ? এর কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি ?

উত্তর : ভবিষ্যৎ যদি থেকে থাকে তবে এইটারই আছে। এ কথা শুধু মনে হচ্ছে না, এটা জানি। কিন্তু এখানেই শেষ করলে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হতে পারে, তাই একটু ব্যাখ্যা করতে চাই। আমার ধারণা থার্ড থিয়েটার মুভমেনটকে কলকাতার বা অন্যান্য জায়গারও অধিকাংশ সমালোচক এবং থিয়েটার-ইনটেলেকচুয়ালস একটা আঙ্গিকের পরীক্ষা বলে মনে করেন। সবচেয়ে বড়ো ভুল এখানেই। আমাদের কাছে থার্ড থিয়েটার কোনো আঙ্গিকের পরীক্ষা নয়। আমাদের আরম্ভ বিষয়বস্তু থেকে। সেই হিসেবে কোনো বিশেষ আঙ্গিক বা স্টাইল বা ফর্ম্ আমাদের লক্ষ্যবস্তু নয়। কোনো বিশেষ ফর্মের প্রতিই আমরা কমিটেড নই। আমাদের কমিটমেনট বিষয়বস্তুতে, আঙ্গিকে নয়। আমাদের বিষয়বস্তু স্টাইলকে ডিকটেট করে, এবং সেই কারণেই প্রায় নাটক থেকে নাটকে আঙ্গিকের বদল ঘটে আমাদের থিয়েটারে। এর থেকেই বোঝা যায়, একসপেরিমেনটাল থিয়েটার গ্রুপ বলতে যা বোঝায় আমাদের গ্রুপ ঠিক তা নয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এখানেই ভুল করেন। আর এ ব্যাপারটা না উপলব্ধি করলে আমাদের বোঝার ক্ষেত্রে এই অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে।

প্রশ্ন : থার্ড থিয়েটার-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলুন।

উত্তর : থার্ড থিয়েটার উঠে এসেছে একটা বিশেষ দেশের, একটা বিশেষ যুগের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে। সেই পরিস্থিতিই দাবি করছে এরকম ধরনের থিয়েটারের এবং সেটা আমাদের কাছে এতই পরিষ্কার, আমি জানি না অন্যদের কাছে পরিষ্কার কিনা, যে আমরা জানি বাদল সরকার না জন্মালেও বা নাটক না করলেও এই থিয়েটার আসত। আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন চেহারায় এই ধরনের থিয়েটার উঠে আসছে। কারণ আমাদের মতো একটা আধা-ঔপনিবেশিক দেশে যেখানে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে শুধু পার্থক্য নয় একটা বিরোধও আছে, যেখানে গ্রামকে শোষণ করছে শহর, যেখানে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল জুড়ে বঞ্চিত এবং দরিদ্র মানুষের বাস, অথচ যাদের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে যেটা অবশ্যই Western oriented সংস্কৃতি নয়, সেখানে এই ধরনের একটা ফ্রী থিয়েটার মুভমেনট উঠে আসতই—কাজেই ভবিষ্যৎ না থেকে উপায় নেই।

প্রশ্ন : নাটক করতে গিয়ে আপনি প্রায় সবরকম মাধ্যমগত এবং প্রযুক্তিগত কলাকৌশল বর্জন করেছেন। আপনার কি মনে হয় না এটা যেন ডন কুইকজোটের মতো 'বাস্তব' এবং 'সময়'কে অগ্রাহ্য করে চলার শামিল ?

উত্তর : আমার মনে হয় এই বর্জন কয়াটারই সবচেয়ে বেশি বাস্তব ভিত্তি আছে। যাঁরা বর্জন করেন নি তাঁদের চেয়ে আমাদের বাস্তব ভিত্তি অনেক বেশি। আমার জানতে ইচ্ছে করে, এই বাস্তবের বস্তুটা কে সিলেকট করছেন। আমরা মনে করি সব জিনিসেরই বোধহয় একটা অ্যাবসোলুট টার্ম্ আছে—সেইভাবেই সবকিছুকে ভাবি। আমি যদি চাই যে আমার দেশের লোকের কাছে থিয়েটার নিয়ে যাব, তাহলে আমার কাছে বাস্তব এই থিয়েটার। কারণ ওই প্রযুক্তিগত জিনিসগুলো থাকলে যেতে পারছি না। তাহলে আমিই বাস্তববাদী—যাঁরা কলকাতা শহরে ওই জিনিসগুলো আঁকড়ে ধরে থাকছেন তাঁরা বাস্তববাদী নন। কিন্তু সেখানে প্রশ্ন ওঠে, তাঁরা তো যেতে চান নি, তাঁরা তো কলকাতাতেই থাকতে চেয়েছেন। সেই হিসেবে তাঁরা বাস্তববাদী। কোন্‌টাকে বাস্তববাদী বলবেন ? কাকে ডন কুইকজোট বলবেন ? ওঁদের, না আমাকে ? আমি তো বলতে পারি ওঁরা ডন কুইকজোট, ওঁদের ওই প্রযুক্তিগত ব্যাপারগুলোকেই তো ডন কুইকজোটিক বলে মনে হচ্ছে আমার। কারণ আমি তো করে দেখেছি, গিয়ে দেখেছি। এই তো গত রবিবারে আমরা ঘুরে এলাম হাওড়ার বাগীপুরের ওদিকে। চাষি এবং মধ্যবিত্ত মিলিয়ে প্রায় হাজার দুয়েক লোক এসেছিল। এদিকে নাগরদোলাও ঘুরছে, ওদিকে ব্রতচারীও হচ্ছে, আবার আমাদের থিয়েটারও হচ্ছে। মাইক্রোফোন আমরা ব্যবহার করি নি, কিন্তু দূরের মাইক্রোফোনের আওয়াজে আমাদের অসুবিধা হচ্ছিল। সেইখানেও, এমনকি বাচ্চাকাচ্চা-সমেত আমরা পিন ড্রপ সাইলেনস পেয়েছি। তা সত্ত্বেও আমি হলাম ড্রন কুইকজোট। কিন্তু ওখানে আমাদের এই প্রযুক্তিগত বা মাধ্যমগত কোনো জিনিসের সাহায্যই তো নিতে হয় নি। বরং দেখেছি, থিয়েটার করা যাচ্ছে টাকার কবল থেকে মুক্ত হয়ে। এখন গ্রুপ থিয়েটারের বড়ো কথাটা কী ? টাকা ছাড়া থিয়েটার করা যায় না। টাকা কী করে জোগাড় হবে ? টিকিট বেচে। টিকিট মানেই কিন্তু তিন, পাঁচ, দশ, পনেরো বিভিন্ন দামের হতে হবে। কিন্তু ওসব আমরা করি না। এই কলকাতা শহরে সেদিনও যখন প্রতি শুক্রবার থিয়েটার করতাম মাত্র এক টাকা করে চাঁদা ছিল। যার এক-টাকা নেই তার কাছে ফ্রী। ওটা শর্ত নয়। কাজেই টিকিট আমরা বেচি না। দ্বিতীয় যেটা, সরকারি অনুদান বা সাহায্য—তার জন্য আমরা আবেদনও করি না। রিচ পেট্রনের কোনো কথাই নেই, কথাটা তুলছিই না। তৃতীয় যেটা—চারমিনার বা অমুক সিগারেট কোমপানির সাহায্য নিয়ে থিয়েটার করা, তা আমরা ভাবতেও পারি না। অথচ আমাদের টাকার কোনো সমস্যা নেই। তাহলে বাস্তববাদী কারা ? অনেকে বলছেন টাকার অভাবে থিয়েটার করা যাচ্ছে না, আর আমরা মনে করি মানুষগুলো থাকলেই থিয়েটার হয়—টাকার কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে কে বাস্তববাদী, আর কে ডন কুইকজোট তা একটু ভেবে দেখার দরকার আছে। আমাদের থিয়েটার আরম্ভই হচ্ছে বিষয়বস্তু থেকে—কনটেনট থেকে। এই কনটেনটটা কী তা যদি খুব সংক্ষেপে বলতে চাই, তাহলে বলতে হবে যে, সেটা হচ্ছে যা চারপাশে দেখি—অথচ ভালো লাগে না, তা বদলাতে চাই। অর্থাৎ এক কথায় সমাজের পরিবর্তন—বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন। এটা যার একটুও বুদ্ধি আছে সেও বোঝে যে পরিবর্তনটা কিছু মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত ঠিক করবে, আর সেটা ঘটবে—তা সম্ভব নয়। পরিবর্তন ঘটাবেন যাঁরা তাঁরা কোথায় আছেন ? তাঁরা নিশ্চয় কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের দর্শক নন। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের দর্শকরা পরিবর্তনের প্রসেশনে যোগ দিতে পারেন কিন্তু তাঁরা বাই দেমসেলভ পরিবর্তন ঘটাবেন না। তাহলে যেতে হবে কাদের কাছে ? এবং তাঁদের কাছে কোন্

থিয়েটার নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে? প্রসেনিয়াম থিয়েটার নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে কি? সংক্ষেপে এই তো হল ব্যাপারটা!

প্রশ্ন: স্পনস(র)ড প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনার অভিমত একটু পরিষ্কার করবেন কি?

উত্তর: এক-এক করে বলি। সরকারি অনুদান নিয়ে যদি আমি থিয়েটার করি, তাহলে আমাকেও ধরে নিতে হয় যে সরকারও সমাজপরিবর্তনের প্রতি ইনটারেসটেড। কিন্তু ওটা বিশ্বাস করি না। সরকার সমাজটাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে, যেখানে আমরা নিয়ে যেতে চাই, তা আমরা বিশ্বাস করি না। কাজেই সরকারের দান নিয়ে কী করে থিয়েটার করা যায় আমি জানি না। তারপর আসে বড়ো-বড়ো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কথা। তারাও পরিবর্তনে বিশ্বাস করে না। তাহলে তাদের টাকা নিয়ে আমি থিয়েটার করি কী করে? আর তাই যদি করি তবে কার থিয়েটার করছি? তাদের থিয়েটার, না, আমার থিয়েটার? এখন যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, যাঁরা ওদের কাছ থেকে টাকাগুলো নিচ্ছেন—সরকার থেকেই হোক বা অন্য কারো কাছ থেকেই হোক—তাঁদের ক্ষেত্রে দাতারা তো আর বলে দিচ্ছেন না যে নাটকের বিষয়বস্তুগুলো কী হবে—তাঁরা তো সেনসর করছেন না। আমি বলব করছেন, ইনডাইরেকটলি করছেন। এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যাঁরা বলবেন তোমরা যতদিন বেঁচে আছ, আমরা যতদিন টিকে আছি, তোমাদের বছর-বছর এত টাকা করে দিয়ে যাব। কি সরকার, কি সিগারেট কোমপানি—তাঁরা সব সময়ই একটা প্রজেকটের জন্য দেয়—তাই নয় কি? পরের বছর বলতে পারে, আমাদের আর টাকা নেই, দিতে পারছি না। সুতরাং সেনসরটা আরো মারাত্মক। ইতিমধ্যেই আমি তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। পাছে টাকাটা বন্ধ হয়ে যায় সেই ভয়ে আমি বিপজ্জনক কিছু করব না—করতে পারব না। তারা বিপজ্জনক মনে করে এমন কিছু করতে পারব না। এ তো সেলফ-সেনসর! এর থেকে ভালো সেনসর তো আর নেই। টাকার উপর নির্ভরশীলতা এই অবস্থাটা আনতে বাধ্য।

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান নাট্যজগৎ সম্পর্কে কিছু বলুন, এবং থার্ড থিয়েটারের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কী ভাবছেন?

উত্তর: পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান নাট্যজগৎ সম্পর্কে কিছু বলা আমার পক্ষে একটু মুশকিল। কারণ, আমি ক্রিটিক নই। দ্বিতীয়ত, আমার থিয়েটারের ধারাটা ভিন্ন বলে প্রসেনিয়াম থিয়েটার দেখে আজকাল আর আনন্দ পাই না। ভয়ানক সীমিত বলে মনে হয়। এর থেকে বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

থার্ড থিয়েটারের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে যে কথা প্রথমেই বলতে চাই তা হল, এটা কোনো বিশেষ ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। বরং একটি বিশেষ সময়ের, বিশেষ দেশের চাহিদা থেকে উদ্ভূত। থার্ড থিয়েটারকে আমি একটা ফিলসফি বলে মনে করি, এটা কোনো ফরমের একসপেরিমেনটেশন নয়। আমি বিশ্বাস করি, একই ধরনের জিনিস ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ভারতবর্ষের বাইরেও বিভিন্ন দেশে—বিশেষ করে যে-সমস্ত দেশে ঔপনিবেশিক শাসন ছিল এবং এখনো ঔপনিবেশিক চরিত্র বজায় রেখেছে সেখানে—অনুরূপ নীড বা চাহিদা আছে। বিভিন্ন লোক সেই প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ভাবে থিয়েটারে নতুন ধারার প্রবর্তন করছেন। সেগুলির নাম থার্ড থিয়েটার হল কিনা, বা আমরা যা করি তার সঙ্গে আঙ্গিকগত বা শৈলীগত মিল আছে কিনা, সেটা ব্যাপার নয়। কাজেই প্রাসঙ্গিক প্রচণ্ডভাবে। আমি এও মনে করি যে, আমরা এ পথে না এলেও অন্য কেউ আসত এবং শেষ পর্যন্ত এটা একটা ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারত। গ্রামে যাবার পর থেকে আমার এই ধারণা আরো ঘনীভূত হয়েছে যে সারা দেশ পড়ে আছে এই থিয়েটারের জন্য। এতকালের থিয়েট্রেটিক্যাল নীডটাকে প্র্যাকটিক্যালিও রিয়লাইজ করেছি ওই সময়। কাজেই থার্ড থিয়েটারের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন: থার্ড থিয়েটারের দর্শন সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর: খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, যাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা, বর্তমান সমাজটা ভালো লাগে না, তারাই পরিবর্তন করতে আগ্রহী, এবং তারা যদি থিয়েটার করে তবে সেই আগ্রহটা তাদের থিয়েটারের সঙ্গেও যুক্ত করতে চায়। খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটাই থার্ড থিয়েটারের ফিলসফি—পরিবর্তনের ফিলসফি। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে একে থিয়েটার ফর সোস্যাল চেনজ-ও বলা যেতে পারে। আবার পরিবর্তনটা আসে সোস্যাল অ্যাকশন থেকে—কাজেই থার্ড থিয়েটারকে থিয়েটার অব অ্যাকশনও বলা যায়। এবং যেহেতু যে-কোনো আর্ট ফরমের মতো থিয়েটারেও কমিউনিকেশনটা মুখ্যত হয় ইমোশনের মাধ্যমে, অনুভূতির মাধ্যমে—বুদ্ধি বা ইনটেলেকটের মাধ্যমে নয়, সেইজন্য এটাকে থিয়েটার অব ফীলিংসও বলা যেতে পারে। পরিবর্তন সম্পর্কে, পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তাবোধ না থাকলে এ নাটক করা সম্ভব নয়, কারণ এই থিয়েটার করার সময় ওই প্রয়োজনীয়তার বোধটাকে যুক্ত করে নিতে হয়। এর থেকে ভালোভাবে ফিলসফি সম্পর্কে বলা মুশকিল।

* * * *

বাদলবাবুর মুখ থেকে তৃতীয় থিয়েটার এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাপার সম্পর্কে কিছু মূল্যবান মতামত জানতে পারলাম। সব কটি প্রসঙ্গকে স্থানাভাবে প্রশ্নোত্তরপর্বে আনা যায় নি। কিন্তু বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার সময়, প্রয়োজনবোধে, বাদলবাবুর প্রতিটি মতামতকে অবিকৃত অবস্থায় উপস্থাপিত করতে এই প্রতিবেদক অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রতিটি প্রসঙ্গের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে চাই না। তবুও যথাসম্ভব চেষ্টা করব প্রতিটি ব্যাপার নিয়েই প্রয়োজনীয় আলোচনা করার।

প্রথমেই তাকানো যাক প্রসেনিয়াম থেকে তৃতীয় থিয়েটারের প্রথম ধাপ অঙ্গন-মঞ্চে উত্তরণের দিকে। ১৯৬৭ সালে নাটক করতে আসার আগে থেকেই বাদলবাবুর চিন্তাজগতে নানাবিধ বিক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটেছিল—প্রশ্নের উত্তরেই আমরা তা জেনেছি। বাদলবাবু এই বিভিন্ন বিক্রিয়া বা পদ্ধতির কোনো একটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে রাজি নন, এবং কালসীমাটিকেও পাঁচ বছরের বেশি বলে মনে করেন।

এখন প্রশ্নাকারে কয়েকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই পশ্চিম বাঙলার তৎকালীন নাট্যজগৎ এবং তদানীন্তন আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের উপর। বাদলবাবু সিনেমা এবং নাটককে পাশাপাশি রেখে, তুলনামূলক আলোচনা করে, মঞ্চবিহীন, নমনীয়, বহনীয় এবং সুলভ যে থিয়েটারের প্রতি রায় দিয়েছিলেন তা কি সত্যিই ওই সময় প্রাসঙ্গিক ছিল? নাকি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগতভাবেই বলেছিলেন, 'থার্ড থিয়েটার আবার মধ্যবিত্তের নয়া খেলনা।'

ষাটের দশকের কলকাতা বা পশ্চিম বাঙলার নাট্যজগৎ যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল, এবং তা ছিল প্রসেনিয়াম থিয়েটার দ্বারাই। প্রতিটি গণ-আন্দোলনের পিছনেই তার সমর্থন ছিল স্পষ্ট। এই গণমুখী থিয়েটারচর্চার নিয়ন্ত্রণ ছিল গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের হাতে। বাদলবাবু বলতে পারেন, ওটা তো মধ্য বিত্ত এবং উচ্চবিত্তের থিয়েটার—অ্যাকাডেমি বা রবীন্দ্রসদনের তিন, পাঁচ, সাত, দশ টাকার টিকিটধারী দর্শকের জন্য শৌখিন বিপ্লবী থিয়েটার। উত্তরে বলতে চাই, ওই সময়ের প্রসেনিয়াম বা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন সম্পর্কে বাদলবাবুর অভিমত হয়তো সর্বাংশে মিথ্যা নয়, কিন্তু তার থেকে প্রসেনিয়াম থিয়েটার বা বদ্ধমঞ্চের অস্তিত্বের যুক্তিগ্রাহ্যতাকেই কি উড়িয়ে দেওয়া যায়? প্রসেনিয়াম থিয়েটার নিঃসন্দেহে বিদেশী আঙ্গিকের থিয়েটার, কিন্তু-তাই বলে আধুনিক ভারতবর্ষের সমাজসচেতন নাট্য আন্দোলনে তার কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না—এই সিদ্ধান্তের কতটুকু বাস্তব বা বিজ্ঞানসম্মত, তাও ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। সবিনয়ে বাদলবাবুর কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, "নবান্ন"-র সাফল্য বা প্রাসঙ্গিকতাকেও কি বাদলবাবু মধ্যবিত্তসুলভ বলে মনে করেন? দ্বিতীয়ত, তৃতীয় থিয়েটারের জন্মের পর উনিই বা কোন্ বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন? মোল্লার দৌড় মশজিদ তক—ওই কারজন পারক পর্যন্ত। আর দু-একবার গ্রাম সফর? বাদলবাবুকে প্রশ্ন করি—সেসবে কি সামাজিক দায়বদ্ধতার থেকেও 'পিকনিক উদ্দীপনা'-ই বেশি ছিল না? ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২—এই ছ বছরের ইতিহাস ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এক জটিল অধ্যায়। ১৯৬৭-র নির্বাচনে ভারতের নটি রাজ্যে অ-কংগ্রেসি শাসনের আগমন, ১৯৬৯-এ কংগ্রেস ভাগ, ১৯৭১-এ বাংলাদেশ যুদ্ধ, এবং ভারতের রাজনীতিতে ইন্দিরা গান্ধীর দৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ।

আর এরই মাঝে পশ্চিম বাঙলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নকশালবাড়ী রাজনীতির আবির্ভাব ওই সময়কে একটা বিশেষ মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল। বস্তুত, আজকের বহু সমস্যার বীজ হয়তো ওই সময়ই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এই অস্থিরতা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পড়তে বাধ্য। বাদলবাবুকে ধন্যবাদ, উনি এই পরিবর্তনটাকে উপলব্ধি করে নাটকের ক্ষেত্রে নতুন ভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু যে নাট্যধারাকে উনি বিকল্প হিসেবে প্রয়োগ করতে চান, ওই জটিল পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে তা কি সত্যিই ওই সময় গ্রহণযোগ্য ছিল? বোধহয় না। বাদলবাবু সম্ভবত ভুলে

গিয়েছিলেন যে, সব আন্দোলনেরই একটা প্রাথমিক ধাপ থাকে, এবং সেই অঙ্কুরকে যাবতীয় প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করতে না পারলে তার ভবিষ্যৎও অন্ধকার হয়ে যায়। নকশালবাদী আন্দোলনের ঠিক অব্যবহিত পরেই 'থিয়েটার অব সোশ্যাল চেনজ'কে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে সমাজপরিবর্তনের কথা বলতে হলে তৃতীয় থিয়েটারের কর্মীদের কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনীর সামনে বেঁচে থাকার ন্যূনতম শর্তকেও বন্ধক রাখতে হত। থার্ড থিয়েটারের, 'শতাব্দী' থেকে আগত, নাট্যকর্মীদের নিয়ে বাদলবাবু অতথানি স্পর্ধা বা সাহস দেখাতে পারেন নি—এটাই তো ইতিহাস। ওই সময় এবিটিএ হলে মধ্যবিত্ত দর্শকের সামনে যে কায়দায় 'সাগিনা মাহাতো' নিয়ে যাত্রা শুরু হয়, বাদলবাবুর শত প্রতিবাদ এবং সততাকে মেনে নিয়েও, তাকে আঙ্গিকের পরীক্ষা ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। তা ছাড়া, এই নতুন নাট্যধারা দিয়ে 'প্রথম' বা 'দ্বিতীয়' কোনো থিয়েটারেরই শতাব্দী-প্রাচীন জড়তাকে ভাঙা যায় না। বাদলবাবুর প্রসেনিয়াম থেকে অঙ্গনমঞ্চে উত্তরণকে তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই আরোপিত বলে মনে হয়। এর চরিত্রে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব চোখ এড়ায় না। বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয় যে বাদলবাবু 'না জন্মালেও বা নাটক না করলেও এই থিয়েটার আসবে'।

তৃতীয় থিয়েটারের আঙ্গিক, প্রয়োগশৈলী এবং সমাজসচেতন ভাবাদর্শের উপর বৈদেশিক প্রভাব আছে কিনা, তাই নিয়ে বিস্তর জল ঘোলা হয়ে গেছে গত ষোলো বছরে। এই প্রতিবেদকের মতে পুরো ব্যাপারটাই অবান্তর, অর্থহীন এবং অপব্যয়িত উদ্যমের শামিল। থার্ড-থিয়েটার দেশী না বিদেশী, নাকি দেশী-বিদেশীর সংমিশ্রণে তৈরি, তা নিয়ে অযথা তর্ক জুড়ে লাভ নেই। এমনও হতে পারে, এই নাট্যধারাটি সম্পূর্ণভাবেই বাদল সরকারের মস্তিষ্কপ্রসূত। কিন্তু জন্মের পর থেকেই সমর্থক এবং সমালোচকরা এই ব্যাপারটি নিয়েই বেশি ব্যস্ত থেকেছেন। শ্রী সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় অপ্রাসঙ্গিক জেনেও খুব সংগত কারণেই প্রশ্নটা রেখেছিলাম। গ্রোটোভস্কি ছাড়াও অন্যান্য যেসব বিদেশী নাট্যধারা এবং ব্যক্তিত্বের নাম থার্ড-থিয়েটারের যে-কোনো আলোচনাতেই বার-বার উচ্চারিত হয়, তার প্রতিটি নিয়েই আলোচনা করেছি। গ্রোটোভস্কি ছাড়া অন্যগুলিকে প্রশ্নোত্তর-পর্বে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নি, কারণ বাদল সরকার এবং থার্ড থিয়েটার সংক্রান্ত সব আলোচনাতেই গ্রোটোভস্কি এবং তাঁর পুয়র থিয়েটার, অপরিহার্য বিষয়। তৃতীয় থিয়েটারের জন্ম এবং ক্রমবিকাশের পিছনে বিদেশী বিভিন্ন নাট্য-আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাদলবাবু অত্যন্ত সততার সঙ্গে স্বীকার করেন, উনি রিচার্ড শেক্‌নারের কাছে শিখেছেন ফ্রী-থিয়েটার-এর ওয়ার্কশপ পরিচালনার কৌশল, জুলিয়েন বেক-এর সমাজসচেতনতা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন এক নতুন লক্ষ্যের পথে, ইউরিলিবিমভের "টেন ডেজ দ্যাট শুক দ্য ওয়য়লড" অথবা জোন লিটলউডের "ওহ্! হোয়ট এ লাভলি ওয়র" দেখে স্তম্ভিত হয়ে ভেবেছেন ভারতবর্ষে সমাজসচেতন এবং গণমুখী নাট্য-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পাশ্চাত্ত্য দুনিয়ার এইসব দিকপাল পরিচালক এবং তাঁদের প্রয়োগনিপুণতা বা বক্তব্যকে কোন্ স্তর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। 'অনুপ্রাণিত', 'প্রভাবিত' প্রভৃতি বিতর্কিত শব্দ প্রয়োগ করে বিতর্ককে আরো ঘোলাটে না করে আমাদের উচিত বাদলবাবুর এই 'অ্যাপ্রোচ'কে ধন্যবাদ জানানো—যে-কোন সৎ নাট্যকর্মীর চোখে এটাই বিজ্ঞানির্ভর বলে বিবেচিত হবে—অন্তত আজকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ সমালোচক এবং বাদলবাবু নিজেও এই ব্যাপারটিতে বড়ো বেশি স্পর্শকাতর। এ প্রসঙ্গের যবনিকা টানার আগে গ্রোটোভস্কি সম্পর্কে কিছু না লিখলে পুরো ব্যাপারটাই হয়তো ধোঁয়াশায় পর্যবসিত হবে। গ্রোটোভস্কির নাট্য-দর্শনের সঙ্গে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করার আগে জানা প্রয়োজন কে এই গ্রোটোভস্কি? পিটার ব্রুকের ভাষায়, "……no-one else in the world, no one since Stanislavski, has investigated the nature of acting, its phenomenon, its meaning, the nature and science of its mental-physical-emotional processes as deeply and completely as Grotowski." ১৯৫৯ সালে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে পোল্যানডের ওপোলে শহরে গ্রোটোভস্কি প্রতিষ্ঠা করেন 'থিয়েটার ল্যাবরেটরি।' তারপর ষাটের দশকের প্রথম থেকেই ওঁর চিন্তা-জগতে যে আলোড়ন শুরু হয় তারই

ফল 'পুয়র থিয়েটার'। গ্রোটোভস্কির নিজের মুখেই শোনা যাক এই উত্তরণের কাহিনী। ১৯৬৫ সালে গ্রোটোভস্কি লিখছেন, 'Since 1960, my emphasis has been on methodology. Through practical experimentation I sought to answer the questions with which I had begun : what is the theatre ? what is unique about it ? what can it do that film and television can not ?' প্রশ্নের উত্তর পেয়ে এই গ্রোটোভস্কিই বলছেন, 'No matter how much theatre expands and exploits its mechanical resources, it will remain technologically inferior to film and television. Consequently, I propose poverty in theatre, we have resigned from the stage-and-auditorium plant'। বাদলবাবুও ঠিক একই ভাবে সিনেমা টিভি এবং নাটককে পাশাপাশি রেখে, নাটকের নিজস্বতা আবিষ্কার করে তৃতীয় থিয়েটারের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। নাটকের শরীর থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন যাবতীয় আভরণ। প্রশ্ন জাগে, এর থেকেই কি প্রমাণিত হয় যে বাদলবাবুর থার্ড থিয়েটার গ্রোটোভস্কির নাট্যতত্ত্বের অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট? সিদ্ধান্ত নেবার ভার বিদগ্ধ পাঠকের উপরই ছেড়ে দেওয়া ভালো। এর পরই আসে অ্যাপ্রোচ-জনিত প্রশ্ন। এ ব্যাপারে শ্রীসরকারের সঙ্গে একমত হতে বাধা নেই। কারণ, আর যাই হোক, বাদল সরকারের মতো সমাজপরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে গ্রোটোভস্কি নিশ্চয়ই নাটক করেন না।

এই নিবন্ধের শেষ লগ্নে এসে যে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই তা হল থার্ড থিয়েটারের প্রাসঙ্গিকতা এবং ভবিষ্যৎ। শুধু থার্ড থিয়েটার নয়, যে-কোনো সাংস্কৃতিক প্রয়াস বা উদ্যমকে বিশ্লেষণ করতে গেলেই এই দুটি বিষয়কে সামনে রেখে এগোতে হবে। মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে একটি কথা পরিষ্কার করে নিতে চাই। বাদল সরকারের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য অনুযায়ী থার্ড থিয়েটারকে, আঙ্গিকের পরীক্ষা না ভেবে, একটি সমাজসচেতন নাট্যদর্শন হিসেবে মেনে নিয়েই আমরা এই পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণকে বিন্যস্ত করব। তার আগে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জগতের বর্তমান প্রেক্ষাপটকে একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। কারণ এই প্রেক্ষাপট বা পরিমণ্ডল থেকে উদ্ভূত চাহিদাই তৃতীয় থিয়েটারের প্রাসঙ্গিকতা এবং ভবিষ্যতের প্রকৃত নিয়ন্তা।

পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম এই দেশের শিল্প-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী ধারাটি আজ শাসক এবং শোষক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় প্রবাহিত। অতিমাত্রায় বিজ্ঞানির্ভর এবং তাৎক্ষণিক চাকচিক্যের পর্যাপ্ত প্রাণাত্মে বলীয়ান এই ধারাটি ধীরে-ধীরে অতি শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই দেশে—শুধু এই দেশে নয়, সম্ভবত সমগ্র বিশ্বেই। যাবতীয় বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল এরা রপ্ত করছে অতিমানবীয় দক্ষতায়। তার পর সেই লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করা হচ্ছে সাংস্কৃতিক জগতের প্রতিটি ধূলিকণায়। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিটি যুগান্তকারী আবিষ্কার আজ এদের কাছে মুনাফা এবং সাংস্কৃতিক শোষণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। পূর্বের ধারণাকে এরা ছুঁড়ে ফেলেছে চূড়ান্ত মমতাহীনতায়, আঁকড়ে ধরেছে নতুন—আরো নতুন কৌশল। যাত্রা থেকে চলচ্চিত্র, সংগীত থেকে সাহিত্য, নৃত্য থেকে ভাস্কর্য—প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ বিজ্ঞানির্ভর সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রয়োজনে, নতুন সাংস্কৃতিক বাজার তৈরির তাগিদে, এরা ভারতের ধ্রুপদী এবং বাদলবাবুর ভাষায় 'দেশজ' সংস্কৃতির দিকেও হাত বাড়াচ্ছে। কলাকৌশলগত দক্ষতা, অভূতপূর্ব প্রয়োগনৈপুণ্য এবং সপ্রতিভ বৈজ্ঞানিক কায়দায় এক লহমায় অতীতকে বর্তমানে নিয়ে আসছে, বর্তমানকে পৌঁছে দিচ্ছে ঐতিহাসিক নসটালজিয়ায়। ধ্রুপদী সংস্কৃতি একই সঙ্গে কাজ করছে ঐতিহ্যের দর্পণ এবং আধুনিকতার আঙ্গিক হিসেবে। সুপরিকল্পিত চক্রান্তে এবং আধুনিক দক্ষতায় একই সঙ্গে কম্পিউটার এবং প্রয়োজনে শূদ্রক, কালিদাস বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে কাজে লাগানো হচ্ছে জনমানসকে আচ্ছন্নতার আবেশে ডুবিয়ে রাখতে। এই সর্বগ্রাসী সংস্কৃতি অতিধনতান্ত্রিক পশ্চিমী দেশগুলির পপ বা রক কালচারকে প্রাচ্যের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে প্রাচ্যেরই লোকশিল্প বা ধ্রুপদী ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে। আশ্চর্য দক্ষতায় এরা ভারতীয় ধর্মীয় সঙ্গীতের কথা এবং পপ সঙ্গীতের সুরকে বাধ্য করছে এক অসম সংগমে লিপ্ত হতে। এই সর্বাত্মক এবং সর্বব্যাপী সংস্কৃতির ছায়ায় দাঁড়িয়ে অতি স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ হারিয়ে ফেলেছে তার মূল্যবোধের যুক্তিগ্রাহ্যতা। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে

জন্ম নেওয়া প্রতিবাদী মূল্যবোধ এক ধাক্কায় হারিয়ে ফেলছে তার ঘনত্ব। একই ব্যক্তি দুপুরে শামিল হচ্ছে প্রতিবাদের মিছিলে আর সন্ধ্যায় তার অস্তিত্ব, তার প্রতিবাদের প্রতিটি অণুপরমাণুর মধ্যে এক লাস্যময় আবেশ ক্ষতিকর ভাইরাসের মতো চুপিসাড়ে ঢুকে যাচ্ছে এইসব সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। সহপ্রতিবাদীর বিষণ্ণ ক্লিষ্ট মুখের প্রতি মমতার বুকে বিকর্ষণের নোনাজল ঢেলে দিচ্ছে প্রাচুর্যপুষ্ট এই-সব সংস্কৃতির প্রতিনিধিদের মুখচ্ছবি—তাদের নয়নাভিরাম পরিমণ্ডলের মায়াবী হাতছানি। এ এক অশুভ সংকট। নিথর, নিস্পন্দ হয়ে যাচ্ছে তার স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিটি কোষ। এসবই আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে, শুধুমাত্র আবেগ, চীন-এজীয় রোমানটিক ভাবালুতা এবং অ্যামেচারি প্রতিবাদী মন নিয়ে সংস্কৃতির চর্চা করা সোনার পাথর বাটির মতোই অবাস্তব। বাদলবাবুর তৃতীয় থিয়েটারের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সত্যকে অস্বীকার করলে চলবে না। বিজ্ঞান কখনো 'সত্য'কে অস্বীকার করে এগোতে পারে না। আর সেই 'সত্য'ই বলে দেয় যে, অন্য যে-কোনো আধা-ঔপনিবেশিক দেশের মতো ভারতবর্ষেও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক সুপরিকল্পিত এবং কেন্দ্রীভূত শোষণপ্রক্রিয়া চলছে। গত ষোলো বছর ধরে বাদলবাবু কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের কেতাবি বিপ্লবীদের সঙ্গে তর্ক করার জন্য যে সময় ব্যয় করেছেন তার একশ ভাগের এক ভাগ ব্যয় করলেই উপলব্ধি করতেন চলচ্চিত্র নয়, এক বিশেষ শ্রেণীর থিয়েটারই আজ সবরকম প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনের প্রগতির পথের কাঁটা। এদের গ্রুপ থিয়েটারের মতো পয়সার জন্য নাটক বা যাত্রা করতে ভাবতে হয় না—সুদূর গ্রামাঞ্চলে কী করে ট্রাকে সেট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক নিয়ে যাওয়া হবে, ভাবতে হয় না বিদ্যুৎহীন অন্ধকারে কী করে আলোর ভেলকি দেখানো হবে। 'থিয়েটার ফর সোশ্যাল চেনজ'-এর সবচেয়ে বড়ো শক্তিকে চিহ্নিত করতেই বোধহয় ভুল করেন বাদলবাবু। যে-কোনো গণমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আজ সবহেয়ে বড়ো দায়িত্ব দেশের মানুষকে তার চেতনারহিত অবস্থা থেকে বের করে আনা। এ কাজে গণনাট্য আন্দোলন যেমন ব্যর্থ হয়েছে, বাদলবাবুর তৃতীয় থিয়েটারও একই পথে যাচ্ছে। 'থার্ড থিয়েটার' গ্রন্থে উনি যে গ্রাম আর শহরের সমন্বয়ের কথা বলেছেন, 'প্রথম' ও 'দ্বিতীয়' থিয়েটারের সংমিশ্রণের কথা বলেছেন, তাতে কিছুটা বাস্তবের ছোঁয়া থাকলেও সেই উদ্দেশ্য থেকে শ্রী সরকার জানত বা অজানত অনেক দূরে সরে এসেছেন। এমন অবস্থায় তৃতীয় থিয়েটারের শিল্পীদের 'সমবেত শারীরী ভঙ্গিমা তথা বিন্যাসের গতি এবং চিত্রকল্প যে অর্থগভীর দ্যোতনা সৃষ্টি করে তা হয়ত 'থিয়েটারের সম্পদ গণ্য হবে' কিন্তু সমাজপরিবর্তনের লক্ষে এর অবস্থান একুলও এগোবে না। আশা করি, বাদলবাবু উপলব্ধি করবেন ১৯৮৬'র মার্চ মাসের তিন দিনের গ্রাম সফর বা এখনকার প্রতি রবিবারের পরিক্রমায় আর যাই হোক কোটি-কোটি বঞ্চিত নিপীড়িত এবং শোষিত মানুষের প্রতিবাদী মূল্যবোধের ঘুমন্ত সত্তাটিকে জাগানো যাবে না। উপলব্ধি করবেন, এও এক মধ্যবিত্ত বিপ্লবী প্রয়াস। বাদলবাবু যখন বলেন যে, থার্ড থিয়েটার অ্যান্দোলনের শেষ কথা হল গ্রামের লোক নিজেদের সমস্যা নিয়ে নিজেরাই নাটক করবে—তখন শুনতে ভালো লাগলেও এর বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দিহান না হয়ে উপায় থাকে না—অন্তত আজকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে। 'মুক্তমঞ্চ' নামক থার্ড থিয়েটারের এই উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছতে হলে যে পরিমাণ বলের প্রয়োজন তা কি এই আন্দোলন আজ অবধি দেখাতে পেরেছে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রথমেই তৃতীয় থিয়েটারের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাপ করে নিতে হবে—যা এই থিয়েটারে নিবেদিত কর্মীদের আত্মনিয়োগের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হওয়া উচিত। কারণ—পরিবর্তন সম্পর্কে, পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তাবোধ না থাকলে এ নাটক করা সম্ভব নয়। এর পরেই আসে চলমান অবস্থার জাড্যের (inertia) দিকটি। একটু আগেই আমরা বর্তমান সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নিয়ে আলোচনা করেছি। ওই শক্তিশালী এবং ক্ষতিকর সাংস্কৃতিক জাড্য বা cultural inertia'কে ভাঙতে না পারলে বাদলবাবুর তৃতীয় থিয়েটারের কোনো ভবিষ্যৎ আছে বলে মনে হয় না।

অভিজিৎ করগুপ্ত

IN-LAWS OR OUTLAWS

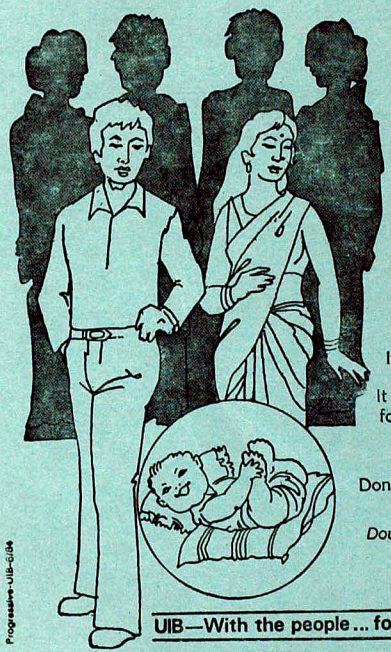

There is nothing like a dowry to give any marriage a bad name. And a bad start

It takes your son's pride away
It makes your daughter lose her dignity
It strains family relations for generations to come.

Help eradicate dowry.
Educate your children.
Don't subsidise a marriage.

Remember,
Dowry is prohibited by law.

Progressive-UIB-6/84

UIB—With the people... for the people.

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED
Head Office : 17, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700 001
Regd. Office : 7, Red Cross Place, Calcutta-700 001